দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ প্রণীত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র

প্রকাশক—
শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
২১১, গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়
পোঃ বেলুড় মঠ, জেলা : হাওড়া
পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম সংস্করণ—১৩৫৮—১১০০
দ্বিতীয় সংস্করণ—১৩৫৯—১১০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ—

(১) মহেশ লাইব্রেরী
২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

(২) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

(৩) শ্রীরামকৃষ্ণ বুক স্টল
দক্ষিণেশ্বর, কলিকাতা-৩৫

(৪) সর্বোদয় বুক স্টল
হাওড়া স্টেশন (Rly.)

প্রিণ্টার—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ সাহা
বাণীশ্রী
১৫/১, ঈশ্বর মিল লেন, কলিকাতা

নিবেদন

ুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায় ত্রিশ বৎসর দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ান করেন। তথায় তিনি প্রথমে পূজকরূপে ছিলেন, পরে সাধনায় উন্মত্ত এবং তদন্তে সিদ্ধিলাভ করেন। সিদ্ধাবস্থায় তাঁহার যশঃসৌরভ স্বতঃই দিকে বিকীর্ণ হয়। তাঁহার দিব্য দর্শন ও পূত সঙ্গ লাভের জন্ত অসংখ্য ও ভক্ত তখন তথায় আসিতেন। তাঁহার লীলাক্ষেত্ররূপেই যেন দক্ষিণেশ্বর া-বাড়ী প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার সাধনা ও সিদ্ধির প্রভাবেই মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী ারিণী দেবী জাগ্রতা এবং দক্ষিণেশ্বর আন্তর্জাতিক পুণ্যতীর্থে পরিণত। । দেশবিদেশের শত শত তীর্থযাত্রী তথায় আগমন করেন এবং তাঁহার ৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি সম্বন্ধে জানিতে চাহেন। তাঁহাদের জন্তই এই া রচিত। ইহাকে 'গাইড বুক' বা প্রদর্শিকা পুস্তিকারূপে উক্ত তীর্থের গণ ব্যবহার করিতে পারেন।

াক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ইতিবৃত্তকে পূর্ণাঙ্গ করিবার জন্তই পুণ্যবতী প্রতিষ্ঠাত্রী রাসমণির জীবনী প্রথমেই প্রদত্ত। কালীবাড়ী সম্বন্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য সমূহ দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংগৃহীত। রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ ন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম ভক্ত ও প্রধান 'রসদ্দার'। প্রায় চৌদ্দ বৎসর ঠাকুরের সভক্তি সেবা করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে তাঁহার মধুর ী তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত। অবশিষ্ট পাঁচটি অধ্যায়ে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ-র সাধনাবলী ও দিব্যলীলা সংক্ষেপে বর্ণিত। রাসমণি ও মথুরানাথ প্রভৃতি াণের পরিবেশে ঠাকুরকে দেখিবার অপূর্ব আলেখ্য এই পুস্তিকায় পাওয়া । উক্ত পরিবেশ অভিনব ও মনোহর। কারণ, ইহাতে সাধক মকৃষ্ণের দিব্য মূর্তি চিত্রিত। সাধারণতঃ ঠাকুরের সিদ্ধাবস্থার চিত্রই ক প্রচলিত। প্রস্ফুটিত কুসুম দেখিতে সকলেই ভালবাসেন। কলিকা পে কুসুমে ফুটিয়া উঠে তাহা অনেক ক্ষেত্রেই অজ্ঞাত থাকে। সাধনা কি

ভাবে সিদ্ধিতে পরিণত হয় তাহা না জানিলে ধর্ম-তত্ত্বের সম্যক্ অবগা
অসম্ভব। এই জন্যই সাধক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনেতিহাস সংক্ষিপ্ত হইলে
প্রেরণাপ্রদ। তীর্থযাত্রীর পক্ষে যাহা অবশ্য জ্ঞাতব্য তাহাই এই পুস্তিক
পাওয়া যাইবে। রাসমণি, মথুরানাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবশ্যকীয় জীবনেতিহ
ব্যতীত কালীবাড়ীর ইতিবৃত্ত অসম্পূর্ণ থাকে। সুতরাং ইহাকে দক্ষিণে
কালীবাড়ীর নির্ভরযোগ্য সম্পূর্ণ ইতিহাস বলিলে ভুল হয় না।

পুস্তিকাটীকে পাঠকপাঠিকাদের মর্মস্পর্শী করিবার জন্য ইহাতে চিত্র দেও
সম্ভব হইল না। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে যে শুভেচ্ছা প্রথম সংস্করণে অপূর্ণ রহি
তাহা পরবর্তী সংস্করণে পূর্ণ করিবার জন্য যত্নশীল হইব। ইহার হিন্দি
ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশের ইচ্ছা আছে। কারণ দক্ষিণেশ্বরের তীর্থযাত্রিগণে
মধ্যে অনেকেই অবাঙ্গালী।

ভক্ত-কবি শ্রীপ্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রামকৃষ্ণ সঙ্গীত বাংলার ভক্ত-সমা
অপূর্ব সমাদর লাভ করিয়াছে। তাঁহার দশটী ভাবময় সঙ্গীত পরিশি
সংযোজিত। এই পুস্তক প্রণয়নে ও প্রকাশনে আমার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ ছি
পুত্রাধিক স্নেহভাজন শ্রীবীরেন্দ্রনাথ প্রতিহার বি. এ বি. টি. এবং শ্রীরবীন্দ্রন
বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহাদের অকুণ্ঠ ও আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত আম
পক্ষে বর্তমান ভগ্ন স্বাস্থ্য ও ক্ষীণ দৃষ্টি লইয়া এই পুস্তিকা প্রস্তুত করা সম্ভব
হইত না। ইহা পাঠে দক্ষিণেশ্বর তীর্থ যাত্রিগণ ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্ব
কিঞ্চিৎ অবগত হইলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে। হরি ওঁ তৎ সৎ।

মহালয়া, আশ্বিন, ১৩৫৮
বেলুড়, হাওড়া

স্বামী জগদীশ্বরানন্দ

দ্বিতীয় সংস্করণের নিবেদন

শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ কৃপায় এই গ্রন্থ প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। অন্ধত্ব ও বৃদ্ধত্বের হেতু এই সংস্করণের আদৌ পরিবর্ধন করিতে পারিলাম না। আশাকরি এই গ্রন্থ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর তীর্থযাত্রীদের নিকট পূর্ববৎ সমাদৃত হইলে আমার সর্বশ্রম সার্থক হইবে। অলমিতি—

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র

বেলুড়, মহালয়া।

গ্রন্থকার-পরিচিতি

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত সন্ন্যাসী এবং বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্রের প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ। ১৯২৫ খ্রীঃ হইতে ১৯৫২ খ্রীঃ পর্য্যন্ত পঁচিশ বর্ষাধিককাল তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রবীণ সন্ন্যাসী এবং করাচি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং কলম্বো, রেঙ্গুন, মহীশূর, লাহোর, বরিশাল ও দেওঘর প্রভৃতি স্থানের মিশন আশ্রমে বহু বর্ষ কার্য্য করেন। ১৯৪৪ খ্রীঃ তৎকর্তৃক আজমীর সহরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। গীতা ও চণ্ডীর অনুবাদক ও জীবনী লেখক ও ধর্ম-প্রচারকরূপে তিনি সারা বাংলায় সুপরিচিত। তদনুদিত গীতা ও চণ্ডীর সওয়া লক্ষাধিক কপি অদ্যাবধি মুদ্রিত হইয়াছে। যোগ, বেদান্ত, উপনিষৎ, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ইংরাজিতে ও বাংলায় প্রায় পঞ্চাশখানি পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন। মডার্ণ রিভিউ, এরিয়ান পাথ, প্রবুদ্ধ ভারত, বেদান্ত কেশোরী প্রভৃতি ইংরাজী মাসিকে এবং বিশ্ববাণী, উদ্বোধন, প্রবর্তক, বসুমতী, বঙ্গলক্ষ্মী, প্রবাসী প্রভৃতি বাংলা মাসিকে বহু বর্ষ যাবৎ তিনি সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও পুস্তক পরিচয় লিখিয়া আসিতেছেন। তিনি কলম্বো, রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির মেম্বার ছিলেন। সংক্ষিপ্ততা, প্রাঞ্জলতা, স্বল্প পরিসরে বহু তথ্য পরিবেশন, আত্মগোপন-প্রবণতা ও সমুদার দৃষ্টিভঙ্গী তৎসৃষ্ট বিশাল সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। অন্তিম জীবনে বেলুড় গ্রামে স্বপ্রতিষ্ঠিত শ্রীরাম-কৃষ্ণ ধর্মচক্র আশ্রমে থাকিয়া কল্কি সাহিত্য এবং একমাত্র অনাগত অবতার কল্কিদেবের প্রচারে ব্যাপৃত আছেন।

শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ মহারাজ

বিষয়-সূচী

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম অধ্যায়

রাণী রাসমণির পুণ্যকাহিনী

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রধান লীলাক্ষেত্র বলিয়া দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ী বিশ্ব-তীর্থে পরিণত। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ এবং ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার নানা দেশ হইতে অসংখ্য নরনারী এখানে তীর্থযাত্রা করিতে আসেন। সাধারণতঃ ইহা 'রাসমণির কালীবাড়ী' নামেই প্রসিদ্ধ। ইহার ইতিবৃত্ত রাসমণির জীবনেতিহাসের সহিত অভিন্ন ভাবে বিজড়িত। কারণ, ইহা রাণী রাসমণির জীবনের অক্ষয় কীর্তি। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী এবং শ্রীরামকৃষ্ণের নামের সহিত রাণী রাসমণির নাম অধুনা বিশ্ববিদিত। যুগাবতারের লীলানাট্যের দৃশ্যপট নির্মাণের ভার যাঁহার উপর সংন্যস্ত হইয়াছিল সেই মহীয়সী মহিলা নিশ্চয়ই চিরস্মরণীয়া ও চিরঞ্জীবী। শ্রীরামকৃষ্ণ যোগজ দৃষ্টি দ্বারা জানিতে পারিয়াছিলেন, রাণী রাসমণি জগদম্বার অষ্ট নায়িকার অন্যতমা।

পশ্চিম বঙ্গে চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তঃপাতী গঙ্গাতীরবর্তী সুপ্রসিদ্ধ হালিসহরের অদূরে কোনা নামক একটী গণ্ডগ্রাম আছে উক্ত গ্রামে জগমোহন দাস নামে এক দরিদ্র মাহিষ্য কৃষক বাস করিতেন। জগমোহনের একমাত্র পুত্র হরেকৃষ্ণই পুণ্যবতী রাসমণির পিতা ছিলেন। ১২০০ সালে ১১ই আশ্বিন (১৭৯৩ খ্রীঃ) বুধবার

হরেকৃষ্ণের ধর্মপ্রাণা পত্নী রামপ্রিয়ার গর্ভে রাসমণি জন্মগ্রহণ করেন। হরেকৃষ্ণ শ্রমজীবী ও কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। স্বীয় সহোদরা ক্ষেমঙ্করীর মুখে কন্যা-জন্মের সুসংবাদ পাইয়া তিনি প্রতিবেশীদিগের পুত্রকন্যাগণকে ডাকিয়া সদ্যোজাত কন্যার কল্যাণার্থ 'হরি-লুট' দেন। তৎপূর্বে রামচন্দ্র ও গোবিন্দ নামে তাঁহার দুই পুত্র লাভ হইয়াছিল। রাসমণি তাঁহার প্রৌঢ়াবস্থার সন্তান। ধর্মপরায়ণ পিতামাতা যখন তিলকধারণ ও সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেন তখন রাসমণি তাঁহাদের কাছে বসিয়া সেই সকল ধর্মানুষ্ঠান দেখিতেন। সন্ধ্যার পরে হরেকৃষ্ণ দাসের গৃহে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত এবং ভাগবতাদি বাংলা ধর্মগ্রন্থ নিত্য পঠিত হইত। শাস্ত্রপাঠ শুনিবার জন্য তাঁহার বাড়ীতে প্রত্যহ বহু নরনারী আসিতেন। সেইজন্য হালিসহর অঞ্চলে কৃষক হরেকৃষ্ণ দাস ধার্মিক বলিয়া সুখ্যাত ছিলেন।

রাণী রাসমণি শৈশবে সহচারিগণের সহিত বাটীর পার্শ্বস্থ বাগানে খেলাধূলা করিতেন। একদিন বৈশাখের মধ্যাহ্নে তিনি দোলনায় দোল খাইয়া একটী পুরাতন ডুমুর গাছের তলায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন, একটী ডুমুর-গুচ্ছের মধ্যে দুই তিনটী ডুমুর ফুল ফুটিয়া আছে। তিনি মাতৃ-মুখে শুনিয়াছিলেন, "ডুমুর ফুল দেখা যায় না; কিন্তু যদি কেহ উহা দেখিতে পায়, সে নিশ্চয়ই ধনী ও সুখী হয়।" রাসমণি অঙ্গুলি নির্দেশে সঙ্গিনীগণকে ডুমুর ফুলগুলি দেখাইলেন, কিন্তু তন্মধ্যে কেহই ইহা দেখিতে পাইল না এবং তাঁর কথায় বিশ্বাসও করিল না। জননী রামপ্রিয়া ইহা শুনিতে পাইয়া কন্যাকে বলিলেন, "মা, তুমি রাজরাণী হবে।" মাতার ভবিষ্যদ্বাণী ও 'রাণী' সম্বোধন কালে বর্ণে বর্ণে সার্থক হইয়াছিল

১৮০০ খ্রীঃ সাত বৎসর বয়সে রাসমণি মাতৃহীনা হইলেন। বিপত্নীক হইয়া হরেকৃষ্ণ দুই পুত্র, এক কন্যা এবং ভগিনী ক্ষেমঙ্করীকে লইয়া শোকতপ্ত অন্তরে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি বাংলা লিখিতে ও পড়িতে জানিতেন এবং স্বয়ং স্বীয় কন্যাকে মাতৃভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখাইয়াছিলেন। এই ভাবে চারি বৎসর কাটিল। সুলক্ষণা রাসমণি একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। পিতা পুত্রীকে সুপাত্রস্থা করিবার জন্য চিন্তিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে বিনা চেষ্টায় যোগ্য পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ স্থির হইল। ১২২১ সালে (১৮০৩ খ্রীঃ) ৮ই বৈশাখ কলিকাতা জানবাজার পল্লীর বিখ্যাত জমিদার রাজচন্দ্র দাসের সহিত রাসমণির শুভ-বিবাহ হইল। তখন রাসমণির বয়স মাত্র এগার বৎসর ছিল।

এখানে রাজচন্দ্রের বংশ-পরিচয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। রাজচন্দ্রের পিতামহ কৃষ্ণরাম দাস জানবাজার মাড়-বংশের আদি পুরুষ। হাওড়া জেলার অন্তর্গত ঘোষালপুর গ্রামে কৃষ্ণরামের পূর্ব নিবাস ছিল। কৃষ্ণরামের তিন পুত্র প্রীতরাম, রামতনু ও কালীপ্রসাদ। পলাশী যুদ্ধের চারি বৎসর পূর্বে ১৭৫৩ খ্রীঃ প্রীতরাম জন্মগ্রহণ করেন এবং শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হন। তিনি ছোট ভাই দুইটিকে সঙ্গে লইয়া ১৭৬৭ খ্রীঃ চৌদ্দ বৎসর বয়সে বর্গীর হাঙ্গামার সময় কলিকাতায় আসেন এবং জানবাজারের তদানীন্তন বিখ্যাত জমিদার মান্নাদের পুরস্ত্রী পিতৃস্বসা বিন্দুবালার নিকটে লালিত পালিত হন। এখন যেখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ অবস্থিত তথায় পূর্বে মান্নাদের আদি গৃহ ছিল। মান্নাবংশের দুই ভাই যুগলকিশোর এবং অক্রূরচন্দ্র প্রীতরামকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাদের যত্নে প্রীতরাম

তৎকালীন পাঠশালায় শিক্ষিত ও বর্ধিত হন। অক্রূরচন্দ্র ডনকিন সাহেবের দেওয়ান ছিলেন। বেলিয়াঘাটায় উক্ত সাহেবের লবণের কারখানা ছিল। অক্রূরচন্দ্রের চেষ্টায় প্রীতরাম লবণের কারখানায় মুহুরীর পদে নিযুক্ত হন। স্বীয় অধ্যবসায়ের বলে উক্ত কারখানায় বেতন ও বাটা প্রভৃতিতে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। ডনকিন সাহেবের মৃত্যুর পর এই কারখানা উঠিয়া যায়। তখন প্রীতরাম কোন পূর্ববঙ্গীয় মহাজনের সহিত মিলিত হইয়া বেলিয়াঘাটায় বাঁশের আড়ত খোলেন। ইহাতে তাঁহার প্রভূত অর্থাগম ও 'মাড়' উপাধি লাভ হয়। অনেকগুলি বাঁশ একত্রে বাঁধিয়া নদীতে যখন ভাসাইয়া আনা হয় তখন উহাকে মাড় বলে। এই মাড়ের ব্যবসা করিতেন বলিয়া প্রীতরাম ও তৎবংশধরগণ মাড় নামে অভিহিত হন।*

প্রীতরাম অল্প ইংরাজি শিখিয়াছিলেন এবং ফোর্ট উইলিয়মের ইংরাজ সৈন্যদের রসদ যোগাইয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করিতেন। যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেট জনৈক ইংরাজ কলিকাতায় আসিয়া কিছু দিন মান্নাদের একটি বাড়ী ভাড়া লইয়া বাস করেন। যুগলকিশোরের সঙ্গে যাইয়া প্রীতরাম উল্লিখিত সাহেবের সহিত পরিচিত হন। সাহেবও অষ্টাদশবর্ষীয় প্রিয়দর্শন কর্মকুশল প্রীতরামকে যশোহরে

---

* শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সাঁতরা প্রণীত "রাণী রাসমণি" (কলিকাতা, ১৩২) এবং শ্রীত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায় রচিত 'দক্ষিণেশ্বর তীর্থযাত্রা" (জয়নগর, ১৩৩৪) এবং শ্রীপ্রসাদদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত "শ্রীদক্ষিণেশ্বর" (দক্ষিণেশ্বর, ১৩১৯) এই পুস্তকত্রয় দেখুন। তৃতীয় পুস্তক সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। স্বামী সারদানন্দ তাঁহার "লীলাপ্রসঙ্গ" পুস্তকে উক্ত পুস্তক হইতে রাজচন্দ্রের ও রাসমণির বংশ-তালিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

লইয়া যান। প্রীতরাম তথায় কিছুদিন থাকিয়া, প্রীতরাম সাহেবের সহিত ঢাকায় গমন করেন। সেখানে অল্পকাল কর্ম করিবার পর উক্ত সাহেবের সাহায্যে তিনি নাটোরের তদানীন্তন রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের ষ্টেটে বিশিষ্ট কর্মচারীপদে নিযুক্ত হন। ১৭৭৭ খ্রীঃ তিনি চব্বিশ বৎসর বয়সে কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয়দাতা জমিদার যুগলকিশোর মান্নার একাদশ বর্ষীয়া কন্যা যোগমায়ার পাণিগ্রহণ করেন। বিবাহের যৌতুকস্বরূপ তিনি জানবাজারে কয়েকখানি বাড়ী এবং ষোল বিঘা জমি প্রাপ্ত হন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রীতরাম আমদানি ও রপ্তানির কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৭৮৭ খ্রীঃ তিনি বার্ণ কোম্পানি নামক ইংরাজ বণিকদলের মুৎসুদ্দি-পদে নিযুক্ত হন। ১৮০০ খ্রীঃ নাটোর ষ্টেটের কয়েকটী পরগণা নিলামে উঠে। দেওয়ান শিবরাম সান্যালের সহায়তায় মকিনপুর পরগণা তিনি ক্রয় করেন। উক্ত পরগণায় উৎপন্ন পণ্য দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য বেলিয়াঘাটায় তাঁহার একটী আড়ত ছিল। প্রীত-রামের দুই পুত্র, হরচন্দ্র ১৭৭৯ খ্রীঃ এবং রাজচন্দ্র ১৭৮৩ খ্রীঃ জন্মগ্রহণ করেন। প্রীতরাম পুত্রদ্বয়কে তৎকালসুলভ শিক্ষাদানপূর্বক যোগ্যা পাত্রীর সহিত বিবাহ দেন। ১৮০২ খ্রীঃ জ্যেষ্ঠপুত্র হরচন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় বিধবা পত্নি রাখিয়া অকালে দেহত্যাগ করেন। ১২০৮ সালে চানক নামক স্থানে কনিষ্ঠ পুত্র রাজচন্দ্রের প্রথম বিবাহ হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই বৎসর তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ ঘটে। প্রীতরাম রাজ-চন্দ্রের দ্বিতীয় বিবাহ দেন তৎপরবৎসরেই। কিন্তু তাঁহার সেই পুত্র-বধূও অকালে গতায়ু হন। ১২১১ সালে ৮ই বৈশাখ (১৮০৩ খ্রীঃ) রাজচন্দ্রের তৃতীয় বিবাহ তিনি দেন। কলিকাতার গোয়ালটুলিস্থ

কোন বাড়ীতে এই শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। রাজচন্দ্রের তৃতীয়া পত্নীই পুণ্যবতী রাণী রাসমণি। প্রীতরামের জীবদ্দশায় রাজচন্দ্র ও রাসমণির দুই কন্যা পদ্মমণি ও কুমারী জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৩ খ্রীঃ প্রীতরাম জানবাজারে বর্ত্তমান প্রাসাদোপম অট্টালিকা নির্মাণ আরম্ভ করেন এবং ১২২৪ সালে (১৮১৭ খ্রীঃ) চৌষট্টি বৎসর বয়সে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকার ধনসম্পত্তি ও জমিদারী রাখিয়া লোকান্তরিত হন।

প্রীতরামের মৃত্যুর পর রাজচন্দ্র পিতার ব্যবসায়ের তত্ত্বাবধানে ও উন্নতিবিধানে যত্নপর হইলেন। ইংলণ্ডে কল্‌ভিন কাউই কোম্পানিকে এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া তিনি কস্তুরী, অহিফেন, নীল প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানি করিতেন। তিনি খুব ভাগ্যবান্ ব্যবসায়ী ছিলেন। নীলামে পঁচিশ হাজার টাকার অহিফেন কিনিয়া এবং সেই দিনেই উহা পঁচাত্তর হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া একদিনে পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করেন। বধূরাণী রাসমণি শ্বশুরালয়ে শ্বশুর ও শাশুড়ীর অশেষ স্নেহাদর লাভ করেন। তিনি সাক্ষাৎ গৃহলক্ষ্মী এবং সর্বপ্রকার গৃহকর্মে সুনিপুণা ছিলেন। তিনি গৃহে আসিবার পর নানা দিকে রাজচন্দ্রের অজস্র অর্থাগম হইতে লাগিল। কলিকাতায় বিভিন্ন রাস্তায় তিনি বহু গৃহ ক্রয় ও নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই সকল বাড়ীর মধ্যে কতকগুলি আশাতীত অধিক মূল্যে বিক্রীত হয়। রাসেল ষ্ট্রীটের জমি ও বাড়ী সরকার প্রায় দুই লক্ষ টাকা মূল্যে ক্রয় করেন। মকিনপুর প্রভৃতি চারিটি মহালের আয়ও প্রচুর ছিল। এইরূপে রাজচন্দ্র তৎকালীন বাংলার ধনকুবেরবর্গের অগ্রগণ্য হন। যাঁহার পত্নী এমন গুণবতী তিনি যে লক্ষ্মী দেবীর বরপুত্র হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কলিকাতার প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, মহাভারতের

বঙ্গানুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ, স্যার রাধাকান্ত দেব রাজা বাহাদুর প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত রাজচন্দ্রের গভীর সৌহার্দ্য ছিল। বাঙ্গালীদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাজচন্দ্র দাসের উদ্যানে ভারতবর্ষের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসেন। ১৬০০ খ্রীঃ রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজকীয় সনদ লাভ করিয়া প্রায় সাড়ে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা মূলধনে ভারতে বিশাল বাণিজ্য আরম্ভ করেন। উক্ত মূলধন এক শত এক অংশে বিভক্ত ছিল। লণ্ডন নগরের অন্যতম ধনকুবের জন বেব সাহেব এই কোম্পানির এক অভিজাত অংশীদার ছিলেন। তিনি ভারত ভ্রমণে আসিয়া কলিকাতায় রাজচন্দ্র দাসের সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। তিনি রাজচন্দ্রকে নানা সম্মানে ভূষিত করেন। তাঁহার সহায়তায় রাজচন্দ্র ও তাঁহার বংশধর ত্রৈলোক্য পঞ্চাশ জন অশ্বারোহী বেষ্টিত হইয়া চতুরশ্বযানে ভ্রমণাদি সম্মানের সনদ প্রাপ্ত হন। জন বেব সাহেব লণ্ডনে ফিরিয়া ১৮২৬ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে বন্ধুবর রাজচন্দ্রকে একটী সোনার ঘড়ি উপহার পাঠান। উক্ত মূল্যবান্ ঘড়ি এখনও যথাস্থানে সংরক্ষিত আছে।

রাজচন্দ্রের ভগিনীপতি রামরতন বাবু হুক ডেভিডসন এ্যাণ্ড কোম্পানির মুৎসুদ্দি ছিলেন। রামরতন বাবুর অনুরোধে রাজচন্দ্র উক্ত বিদেশী কোম্পানিকে এক লক্ষ টাকা ঋণ দিতে স্বীকৃত হন। পরে যখন তিনি শুনিলেন, উক্ত কোম্পানি দেউলিয়া হইয়া বিলাতে ফিরিয়া যাইতেছেন তখনও তিনি পূর্বদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন নাই। আবার সেই সময় তাঁহার মাতা যোগমায়া মৃত্যুশয্যায় শায়িতা। রামরতন বাবু উক্ত সাহেবকে লইয়া আসিলে সত্যনিষ্ঠ

রাজচন্দ্র তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা গণিয়া দিলেন। পরে তিনি রামরতন বাবুকে একান্তে ডাকিয়া বলিলেন, "সাহেব দেউলিয়া হয়েছেন জেনেও আপনার জন হয়ে এ কাজটা করা কি আপনার ভাল হয়েছে?" ইহাতে রামরতন বাবু অপ্রস্তুত হইয়া উত্তর দিলেন, "আপনিও ত বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন; 'না' বলিলেই ত পারিতেন!" তাহাতে উদারচেতা রাজচন্দ্র বলিলেন, "একবার এই মুখে দিব বলিয়া আবার 'না' বলিতে শিখি নাই!"

রাজচন্দ্র ও রাসমণির চারিটী কন্যা পদ্মমণি, কুমারী, করুণাময়ী ও জগদম্বা যথাক্রমে ১২১৩, ১২১৮, ১২২৩, (১৮১৭ খ্রীঃ) এবং ১২৩০ সালে (১৮২৩ খ্রীঃ) ভূমিষ্ঠা হন। ১২২৬ সালে (১৮১৯ খ্রীঃ) রাসমণি একটি মৃত পুত্র প্রসব করেন। ১২৩০ সালে বাংলায় যে প্রবল বন্যা হয় তাহাতে রাণী দুর্গতদিগকে আশ্রয় ও আহারাদি দানার্থ বিপুল অর্থব্যয় করেন। উক্ত সালে (১৮৩১ খ্রীঃ) তাঁহার পিতা হরেকৃষ্ণ দাসের মৃত্যু হয়। সেই বৎসর তাঁহার তৃতীয়া কন্যা করুণাময়ী দেহত্যাগ করেন। পিতার চতুর্থী করিতে গঙ্গাতীরে যাইয়া রাণী দেখেন, ঘাট পঙ্কিল, বন্ধুর ও ভগ্নপ্রায়। তিনি স্বগৃহে ফিরিয়া উক্ত ঘাট নির্মাণের জন্য রাজচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। ধর্মপত্নীর পরামর্শে রাজচন্দ্র বিপুল অর্থব্যয়ে বাবু রোড ও বাবু ঘাট নির্মাণ করাইয়া দেন। উক্ত ঘাট ছত্রিশ থাম ও চাঁদনী দ্বারা শোভিত। ইহার উপরে প্রস্তর ফলকে ইংরাজিতে খোদিত আছে, "ভারতের গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের অনুমতিক্রমে এবং বাবু রাজচন্দ্র দাসের অর্থব্যয়ে ১৮৩০ খ্রীঃ এই ঘাট নির্মিত এবং ইহার নাম 'বাবু রাজচন্দ্র

দাস ঘাট"।* ইহার পর দুই বৎসরের মধ্যেই বাবু রোড নির্মিত হয়। জানবাজারস্থ গৃহ হইতে বাবু রোডের কিয়দংশকে এখন "রাণী রাসমণি রোড" বলে। মাতা যোগমায়ার স্মৃতিরক্ষার্থ আহিরীটোলায় গঙ্গাতীরে স্নান-ঘাট নির্মাণ, নিমতলায় মুমূর্ষু গঙ্গা-যাত্রীদের জন্য গৃহনির্মাণ, মেটকাফ হলে সরকারী গ্রন্থাগারের উন্নতিকল্পে দশ হাজার টাকা দান, বেলেঘাটায় খাল খননের জন্য সরকারকে জমি দান প্রভৃতি রাজচন্দ্রের স্মরণীয় কীর্তি। রাজচন্দ্র বহু দরিদ্র ছাত্রের ব্যয়ভার বহন করিতেন। চাণকের তালপুকুর অন্যের ছিল। উহা স্বীয় ব্যয়ে খনন করাইয়া তিনি দরিদ্র গ্রামবাসিগণের জলকষ্ট দূর করেন।

এই সকল জনহিতকর পুণ্য কার্য্যের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজচন্দ্রকে ১৮৩৩ খ্রীঃ 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। জানবাজারে "রাণী রাসমণি কুঠী'র নির্মাণকার্য্য ১২২০ সালে আরব্ধ এবং ১২২৮ সালে সমাপ্ত হয়। সাড়ে ছয় বিঘা জমিতে পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে আট বৎসর ধরিয়া এই সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মিত হয়। ইহা প্রাসাদোপম, কারুকার্য্য-মণ্ডিত ও সুবিশাল। ভগবান্ রামকৃষ্ণ উক্ত কুঠীতে বহু বার পদার্পণ করিয়াছেন। উহার ঠাকুর-দালানে যখন দুর্গাপূজা হইত তখনও শ্রীরামকৃষ্ণ যাইতেন এবং কয়েক দিন থাকিতেন। রাজচন্দ্র বৈশাখ মাসের এক মধ্যাহ্নে বিশ্রাম করিতে-ছিলেন। এমন সময় এক গেরুয়াধারী জটামণ্ডিত নগ্নপদ অপরিচিত

---

* এই ঘাটকে এখনও লোকে 'বাবু ঘাট' বলে। জানবাজারে রাণী রাসমণির নামে একটী বিদ্যালয়ও অধুনা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহাকে সার্ধহস্ত-পরিমিত রামমূর্তি উপহার দিয়া যান। মহাধূমধামে উক্ত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত হয়। কিছু কাল পরে ইহা অপহৃত হইয়া যায় এবং তৎপরিবর্তে নূতন এক মূর্তি স্থাপিত হয়। ১২৪৩ সালে (১৮৩৬ খ্রীঃ) রাজচন্দ্র সর্দিগর্মী অংশু-ঘাত (heat appoplexy) রোগে আক্রান্ত হন এবং উক্ত রোগেই তিপ্পান্ন বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। রাণী রাসমণি চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইলেন। শোনা যায়, রাণী পতি-বিয়োগে তিন দিন ও তিন রাত্রি অনশনে ও ধরাসনে ছিলেন। পতিপ্রাণা রাসমণি পঞ্চান্ন হাজার টাকা ব্যয়ে স্বর্গগত পতি রাজচন্দ্রের শ্রাদ্ধ ক্রিয়া মহাসমারোহে সম্পন্ন করেন। বাগবাজার নিবাসী কুলগুরু রামসুন্দর চক্রবর্তী এবং পুরোহিত উমাচরণ ভট্টাচার্য্যের তত্ত্বাবধানে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। পতির শ্রাদ্ধে রাণী তুলট করেন এবং তৌলদণ্ডে স্বদেহের ওজনে রৌপ্যমুদ্রা পরিমাণ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। ইহাতেও ছয় সহস্রাধিক রৌপ্যমুদ্রা বিতরিত হয়!

মনুসংহিতায় আছে—

মৃতে ভর্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বয়ং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

অনুবাদ—পতির মৃত্যুতে সাধ্বী বিধবা পুত্রহীনা হইলেও ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলে স্বর্গে গমন করেন। হিন্দু বিধবার পক্ষে ধর্মশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য বা সহমরণ বিধান করিয়াছেন। স্বায়ম্ভুব মনুর বংশধর রাজা পৃথুর মহিষী অর্চি সহমৃতা হন। এই পৃথুর নামানুসারে মর্ত্যের নাম পৃথ্বী বা পৃথিবী। রামায়ণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে দেখা যায়, বিধবাদের মধ্যে কেহ বা ব্রহ্মচর্য্য পালন, কেহ বা সহমরণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের

স্বষ্ট পত্নী সহমৃতা হন, কিন্তু রাজা পাণ্ডুর উভয় পত্নীর মধ্যে কনিষ্ঠা মাদ্রী সহমৃতা হন এবং জ্যেষ্ঠা কুন্তী ব্রহ্মচারিণী ছিলেন। কোন কোন শাস্ত্রমতে বিধবার পক্ষে ব্রহ্মচারিণী থাকাই সহমরণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট-তর। কারণ, ব্রহ্মচারিণী সৎকর্মরতা ও ভক্তিপরায়ণা থাকিয়া সামাজিক জীবনের উন্নতি সাধনের ব্রতিনী হয়। পুণ্যশীলা রাসমণির জীবন ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাণী ভবানী, রাণী স্বর্ণময়ী প্রভৃতির ন্যায় রাণী রাসমণি সারা জীবন পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ধর্মোৎসবে তিনি শত শত, সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিতেন। বার মাসে তের পার্বণ এত সমারোহে তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইত যে, তাহা কালে প্রবাদে পরিণত হয়। ১২৪৫ সালে রাণী রাসমণি রথোৎসবের মানস করেন। উক্ত উৎসবে সাধারণতঃ দারুময় রথ নির্মিত হয়; কিন্তু রাণীর ইচ্ছা হইল রৌপ্যময় রথ নির্মাণের। জামাতা মথুরানাথ কলিকাতার বিখ্যাত বিদেশী জহুরী হ্যামিল্টন কোম্পানীর দ্বারা সংকল্পিত রথ নির্মাণের প্রস্তাব করেন।

কিন্তু রাণীর ইচ্ছানুসারে তিনি বঙ্গদেশীয় প্রসিদ্ধ কারিকরগণ দ্বারাই রথ প্রস্তুত করাইলেন। চক্র-চতুষ্টয় ব্যতীত উক্ত রথের অবশিষ্ট অংশ রৌপ্যময় ছিল। উক্ত সালে আষাঢ় মাসে স্নানযাত্রার দিন নব রথ প্রতিষ্ঠিত হইল। গৃহদেবতা রঘুনাথজী রথে বসিলেন। কলিকাতার রাজপথে নয়নানন্দকর রৌপ্যরথ বাহির হইল। রথোৎসব অষ্টাহব্যাপী চলিল। ১৮৩৮ খ্রীঃ প্রথম বৎসর রথের নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। কলিকাতার রাজপথে সেই রথ টানা হইল। রথোৎসবের শোভাযাত্রায় শতাধিক বাদ্যকর এবং শত শত গায়কের বাদ্যগানে মহানগরী মুখরিত হইল। রথের সম্মুখে রাণীর

কুলগুরু স্বর্ণছত্র তলে নগ্নপদ জামাতাগণ সমভিব্যাহারে চলিলেন
প্রতি বৎসর ৪।৫ শত লোক রথ-রজ্জু ধরিয়া টানিতেন। শোভাযাত্র
অর্ধক্রোশব্যাপী সুদীর্ঘ হইত। রথোৎসবে আড়াই তিন মন জু‍ঁই
ফুলের মালা লাগিত। রাণীর জীবণকালে কয়েক বৎসর ধরিয়া উক্ত
উৎসব হইয়াছিল। এত ধূমধামে রথোৎসব আজকাল দেখা যায় না

পূর্ববঙ্গে রাণী ভবানীর দুর্গোৎসবের ন্যায় দক্ষিণ বঙ্গে রাণী রাস-
মণির দুর্গোৎসব স্মরণীয়। রাজচন্দ্র দাসের সময় হইতেই দুর্গোৎসব
হইত। রাসমণির সময়ে উহাতে ধূমধাম আরও বাড়িয়া গেল
ইহা প্রায় এক শতাব্দী পূর্বের কথা। তখনও রাণীর দুর্গোৎসবে ৫০।৬০
হাজার টাকা ব্যয়িত হইত। পাঁচ সাত শত সধবাকে শাড়ি, শাঁখ
ও সিন্দুর এবং সহস্রাধিক কুমারীকে নববস্ত্র ও আহার দেওয়া হইত
অষ্টাহব্যাপী দুর্গোৎসবে কোন দিন দাশুরামের পাঁচালী, কোন দিন
গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা, কোন দিন আখড়াই প্রভৃতি হইত। এক
বৎসর দুর্গোৎসব কালে ষষ্ঠির দিন প্রত্যুষে যখন ব্রাহ্মণগণ বহু লোক
সহিত বাদ্যরোলে চারিদিক মুখরিত করিয়া নব পত্রিকা স্নান করাইতে
যাইতেছিলেন তখন কোন সাহেব বাবু রোডের পার্শ্ববর্তী প্রাসাদে
নিদ্রিত ছিলেন। সাহেবের সুনিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি বাদ্যরোল
বন্ধ করিতে আদেশ পাঠান। কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে?
সাহেব অবিলম্বে পুলিশ অফিসারের নিকট লিখিত অভিযোগ করেন।
দুর্গোৎসবের পরেই রাণীর উপর সরকারী কঠোর নিষেধাজ্ঞা আসিল।
ক্রমে তুমুল মোকদ্দমা বাধিল। রাণী লোক মারফৎ সরকারী সনদ
আদালতে দেখাইলেন এবং বলিলেন, "ইহা আমার রাস্তা। আমি
যাহা ইচ্ছা করিব। সরকার বাহাদুর বাধা দিলে আমি যে ব্যয়ে রাস্তা

করিয়াছি উহার দ্বিগুণ ব্যয়ে ভাঙ্গিয়া দিব।" সরকারী হুকুম অমান্য করার জন্য মোকদ্দমায় রাণীর ৫০ টাকা জরিমানা হইল। জরিমানা দিয়াই রাণী জানবাজারস্থ গৃহ হইতে বাবুঘাট পর্য্যন্ত সমগ্র বাবু রোডের দুই দিকে বড় বড় গরাণকাঠের বেড়া দিলেন এবং অন্যান্য রাস্তার গমনাগনন পথ রুদ্ধ করিলেন। সরকারের কড়া হুকুম আসিল, "অচিরে বেড়া খুলিয়া লওয়া হউক।" নির্ভীক ভাবে রাণী উত্তর দিলেন, "আমার রাস্তায় সরকারের কোন প্রয়োজন থাকিলে আমাকে উচিত মূল্য দিলে রাস্তা খুলিয়া দিব, নচেৎ নহে।" কলিকাতায় হৈ চৈ পড়িয়া গেল। সারা বাংলায় রাণীর নামে জয়ধ্বনি উঠিল। তখন কোম্পানী রাণীকে অনুরোধ করিয়া রাস্তা খোলাইলেন এবং জরিমানার টাকা ফেরৎ দিলেন। রাণীর সুদৃঢ় সংকল্প রক্ষিত হইল। স্বীয় ব্যয়ে নির্মিত বাবু রোড রাণী বরাবর খাসে রাখিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনায় জনসাধারণ কর্তৃক নিম্নোক্ত ছড়া রচিত হয়।—

"অষ্ট ঘোড়ার গাড়ী দৌড়ায় রাণী রাসমণি।
রাস্তা বন্ধ করতে পাল্লে না ইংরাজ কোম্পানী॥

এই সময় হইতে শোভাযাত্রাদির জন্য পাশ লইবার প্রথা সরকার কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইল। তৎপূর্ব্বে উক্ত প্রথা প্রচলিত ছিল না।

গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা রঘুনাথজীর দোলোৎসব ও রাসোৎসব হইত। এই সকল উৎসবে কি ধুমধাম ও মহানন্দ চলিত তাহা যিনি দেখেন নাই তাঁহাকে বলিয়া বুঝান যায় না। দোলের দিন গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ ওস্তাদ জ্বালাপ্রসাদ আসিয়া গান করিতেন। দোলোৎসবের প্রাতঃকালে রঘুনাথজীকে ঠাকুর দালানে আনিয়া মঞ্চোপরি বসান

হইত। রাণীর জামাতাগণ স্নানান্তে পট্টবস্ত্র পরিধানপূর্বক গঙ্গাজল ছড়াইতে ছড়াইতে অগ্রবর্তী হইতেন এবং পশ্চাতে পুরোহিত রঘুনাথজীকে লইয়া আসিতেন। এই উৎসবের পর জানবাজারের রাস্তা ফাগাদি রঙে লাল হইয়া থাকিত। বাড়ীর প্রাঙ্গনে, বারন্দায় ছাদে ও ভিতরে এত আবির পড়িয়া থাকিত যে, সপ্তাহ কাল সকলে ফাগের উপর দিয়াই যাতায়াত করিতেন। উৎসবান্তে সংস্কার ব্যতীত বাড়ী বাসযোগ্য হইত না। রথোৎসবেও রঘুনাথজী ঠাকুর দালানে আসিয়া বসিতেন। তখন সমস্ত প্রাসাদ আলোকিত ও আমোদিত হইত। ঠাকুরের সম্মুখে মোম নির্মিত প্রমাণ কদম্ব বৃক্ষ ও তাহাতে মোমের ফুলও শোভা পাইত। তিন দিন সন্ধ্যার পর বহু ব্রাহ্মণ মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করিতেন। এইরূপে জন্মাষ্টমী, বাসন্তীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা ও কার্ত্তিক পূজাদিতে মহোৎসব হইত। বিবিধ যন্ত্রবাদ্য ও কণ্ঠসঙ্গীত, নাটকাভিনয় ও কুস্তি প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গীভূত ছিল।

১২৫৭ সালে রাণী রাসমণি জগন্নাথদেব দর্শনার্থ পুরীতীর্থে যাত্রা করেন। তখন কলিকাতা হইতে পুরীধাম পর্য্যন্ত রেলপথ হয় নাই। গঙ্গানদী দিয়া বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া নৌকারোহণে পুরী যাইতে হইত। বহু আত্মীয়া এবং কুটুম্বিনী সমভিব্যাহারে রাণী রাসমণি তীর্থযাত্রা করিলেন। নৌকাগুলি গঙ্গানদী উত্তীর্ণ হইয়া সাগর-সঙ্গমে পড়িতেই অকস্মাৎ ভীষণ ঝড় উঠিল। বাত্যা-বিক্ষুব্ধ সাগর-বক্ষে নৌকাসমূহ মগ্নপ্রায় হইল। রাণী এই দুর্য্যোগে বাধ্য হইয়া নৌকা হইতে নামিয়া কোন পার্শ্ববর্তী পর্ণকুটিরে আশ্রয় লইলেন। ঝড় থামিলে পরদিন পুনরায় তিনি নৌকায় উঠিয়া চলিলেন। সুবর্ণরেখা নদীর পরপারে

যাইয়া তিনি দেখিলেন, পুরীধামে যাইবার ভাল রাস্তা নাই। তদ্দত্ত অর্থে সুবর্ণরেখা হইতে পুরীধাম পর্য্যন্ত উত্তম পথ প্রস্তুত হইল। উক্ত তীর্থে প্রায় ষাট হাজার টাকা ব্যয়ে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাকে তিনি হীরকাদি-খচিত তিনটী মুকুট দান করেন। পরবর্তী বৎসর রাণী গঙ্গাসাগরে ও ত্রিবেণীতে স্নান করেন। ত্রিবেণী হইতে তিনি নবদ্বীপ ও অগ্রদ্বীপ প্রভৃতি তীর্থে যান। তথা হইতে প্রত্যাগমনের পথে চন্দনগরের নিকটে গরুটীর জঙ্গলে তিনি ডাকাতের হাতে পড়েন এবং বার হাজার টাকা দিয়া তাহাদের কবল হইতে রক্ষা পান।

উত্তরায়ণে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান সমাপনান্তে রাণী জন্মভূমি দর্শনার্থ কোনা গ্রামে গমন করেন। তৎপূর্বে পিসীমাতা ক্ষেমঙ্করী স্বর্গগতা হইয়াছেন এবং ভ্রাতৃদ্বয় রামচন্দ্র ও গোবিন্দ ভগিনীর নিকট জান-বাজারেই থাকেন। পিত্রালয়ে গৃহাদি কিছুই ছিল না, কেবল জমির খাজনা রাণী বৎসর বৎসর দিতেন। রাণী লোক পাঠাইয়া তথায় বাসোপযোগী অস্থায়ী ঘর নির্মাণ করাইলেন এবং উহাতে ত্রিরাত্রি রহিলেন। বিবাহের ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পরে প্রথম বার তিনি কোনা গ্রামে গেলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য কোনা এবং তৎপার্শ্ববর্তী বহু গ্রাম হইতে অসংখ্য নরনারী আসিল। রাণী তথায় প্রচুর অর্থ ও বস্ত্রাদি দান করেন। কোনাবাসী ব্রাহ্মণগণের অনুরোধে তিনি ৩০।৩৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করিলেন পার্শ্ববর্তী গঙ্গাতীরে পাকা ঘাট নির্মাণার্থ। স্বর্গীয়া জননী রামপ্রিয়ার স্মৃতিরক্ষার্থ উক্ত ঘাট উৎসর্গী-কৃত হয়। বাবুগঞ্জের নিকটেও রাণী রাসমণির অর্থব্যয়ে নির্মিত গঙ্গা-ঘাট আছে। হালিসহর হইতে গঙ্গাপার হইয়া রাণী বংশবাটীর দেবী হংসেশ্বরী দর্শনে যান এবং তথায় হংসেশ্বরীর প্রতিষ্ঠাত্রী রাণী শঙ্করীর

সহিত সাক্ষাৎ করেন। রাণী শঙ্করী ছিলেন রাজা নৃসিংহ দেবরায়ের ধর্মপত্নী। রাসমণি বংশবাটীর ব্রাহ্মণদিগকে অর্থাদি দান করিতে চাহিলে শঙ্করী বলিলেন, "মা, তুমি যদি তাহাদিগকে দান কর, আমি কাহাদের দিব ?" রাসমণি নবদ্বীপে গ্রহণ-স্নানান্তে পাঁচ শত জোড় গরদ কাপড় প্রণামী সহ পণ্ডিতগণকে বিতরণ করেন। এইরূপে দীর্ঘ চারি বৎসর তীর্থভ্রমণে তাঁহার চারি পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। সন্ত কবীর সত্যই বলিয়াছেন—

কবিরা গুরুকে মিলনকী শুনি বাত হাম্ দোয়।
কই সাহেবকা নাম লেয়, কই কর-উচাঁ হোয়॥

অনুবাদ—কলিকালে ঈশ্বরলাভের দুইটি প্রশস্ত পথ কবীর স্বীয় গুরুর মুখে শুনিয়াছিলেন। জপ ও দান সেই দুই পথ।

রাণী রাসমণি ইষ্ট নাম জপ এবং অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন তাঁহার দানের কথা লোকমুখে সারা বাংলায় প্রচারিত হইয়াছিল পুণ্যকর্ম অনুষ্ঠান দ্বারা তিনি চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন।

রাণীর প্রজাদের মধ্যে অসংখ্য জেলে ছিল। তাহারা গঙ্গায় জাল ফেলিয়া মাছ ধরিত এবং তাহা বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত সরকার হঠাৎ জেলেদের উপর মৎস্যকর ধার্য্য করিলেন। জেলেরা রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির নিকট যাইয়া উহার প্রতিকার প্রার্থনা করিল। কিন্তু কেহই জেলেদের পক্ষে দাঁড়াইয়া সরকারের সহিত লড়িতে সাহসী হইলেন না। তখন জেলেরা রাণী রাসমণির শরণাপন্ন হইল। দয়াবতী রাসমণি ধীবর প্রজাদিগকে আশ্বাস দিলেন এবং ঘুসুড়ী হইতে মেটিয়াবুরুজ পর্য্যন্ত গঙ্গা দশ হাজার টাকায় জমা লইয়া দড়ি ও বাঁশ দিয়া ঘেরিয়া ফেলিলেন। জেলেরা নিশ্চিন্ত হইয়া মা

রিতে লাগিল এবং গঙ্গায় জাহাজ ও নৌকা গমনাগমন বন্ধ হইল। রাণীর নিকট সরকারের হুকুম আসিল, অচিরে সাধারণ ও সরকারী জলযান গমনার্থ জলপথ মুক্ত করিয়া দেওয়া হউক্। রাণী জানাইলেন, 'আমি টাকা দিয়া গঙ্গা জমা লইয়াছি। বাষ্পীয় পোত যাতায়াতহেতু মাছ অন্যত্র চলিয়া যায়। তাহাতে আমার জেলে প্রজাদের বিশেষ ক্ষতি হয়। আইনতঃ আমি গঙ্গাপথ বন্ধ করতে পারি।" অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সরকার রাণীর টাকা ফেরৎ এবং জলকর তুলিয়া দিলেন। ইহাতে রাণীও জলপথ মুক্ত করিলেন এবং জেলেরা নিষ্করে মাছ ধরিতে লাগিল। বাংলায় রাণীর নামে পুনরায় জয়ধ্বনি উঠিল। রাণী বহু কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণকেও অর্থসাহায্য করিতেন।

স্বর্গগত রাজচন্দ্র স্বীয় বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে দুই লক্ষ টাকা ঋণ দিয়াছিলেন। বুদ্ধিমতী রাসমণি সুকৌশলে উক্ত অর্থ প্রিন্সের নিকট হইতে আদায় করেন। প্রিন্স নগদ টাকা দিয়া ঋণ শোধ করিতে অসমর্থ হইয়া রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত পরগণা স্বরূপপুর তালুক রাণীকে ছাড়িয়া দেন। কিছু দিন পরে প্রিন্স দ্বারকানাথ রাণীর জমিদারীর ম্যানেজার হইবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। তীক্ষ্মবুদ্ধি রাসমণি স্বীয় অসম্মতি এই ভাবে জ্ঞাপন করেন, "আপনার মত সুযোগ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে এই সামান্য সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে বলা আমার ধৃষ্টতা মাত্র। আমার পুত্রস্থানীয় ভাবী উত্তরাধিকারী জামাতারাই ইহার পরিচালনা করিতে পারিবে। বিশেষতঃ মথুর এই কার্য্যে অতিশয় সুদক্ষ।" ১৮৫৬ খ্রীঃ কানপুরে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। টোটায় শূকর ও গাভীর চর্বি মিশ্রিত থাকে। সেই টোটা দন্ত দ্বারা ছিন্ন করিয়া বন্দুকে পুরিতে হইবে। এই কারণে সিপাহীরা বিদ্রোহ

করে। কাশ্মীর হইতে বাংলা পর্য্যন্ত বিদ্রোহাগ্নি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নেপালের প্রধান মন্ত্রী পৃথিবী-বিক্রম জঙ্গ বাহাদুর গুর্খা সৈন্য সহিত কানপুরে যাইয়া ইংরাজকে সাহায্য করেন। রাণী ঐ সময় সরকারকে ২টী হাতি, ৪০টী ঘোড়া, ৬০টী ভেড়া, ১০০টী ছাগল, ৫০টী মুরগী ও বহু খাদ্যদ্রব্য উপহার পাঠান এবং স্বীয় গৃহে গোরা প্রহরী নিযুক্ত করেন।

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে জানবাজার বাটীতে এক লোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। উক্ত বাটীর অদূরে ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে এক দল দুদ্ধর্ষ গোরা সৈন্য থাকিত। তাহাদের অধিনায়ক থাকা সত্ত্বেও তাহারা পার্শ্ববর্তী স্থানে ভয়ানক উৎপাত করিত। তাহারা দল বাঁধিয়া রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সুযোগ পাইলেই পথিককে অপমানিত ও উৎপীড়িত করিত। তাহারা কখনো দোকানের দ্রব্যাদি, কখনো বা তহবিল লইয়া পলাইত। এক সায়াহ্নে চারজন মাতাল সৈনিক রাসমণি কুঠীর সম্মুখে কোন অসহায় পথচারীর সর্বস্ব অপহরণান্তে তাহাকে প্রহার করিতে থাকে। রাণীর জামাতাগণ তখন স্বগৃহের ছাদোপরি বৈকালিক পাদচারণ করিতেছিলেন। বিপন্ন পথিকের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা দৌবারিকগণকে হুকুম দিলেন। তৎক্ষণাৎ বলশালী দৌবারিকগণ গোরা সৈন্যগণকে প্রহার করিল। প্রথম সৈন্যগণ ছাউনিতে যাইয়া খবর দিল এবং অবিলম্বে ৫০।৬০ জন অস্ত্রধারী সৈনিক আসিয়া 'রাসমণি কুঠী' আক্রমণ করিল। ক্রোধোন্মত্ত সৈনিকগণ বদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া অন্দরে ঢুকিল এবং পৈশাচিক অভিনয় আরম্ভ করিল। রাণীর জামাতাগণ পশ্চাৎদ্বার দিয়া পলাইয়া মান্না বাবুদের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। রাণী স্বয়ং ভৈরবী মূর্ত্তিতে উলঙ্গ

পাণ হস্তে লইয়া রঘুনাথজীর মন্দিরে রহিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কান সৈনিক রঘুনাথ মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইল না। মথুরনাথ াটীতে ছিলেন না। তিনি রাত্রি দশটার সময় গৃহদ্বারে আসিয়া কল সংবাদ পাইলেন এবং অবিলম্বে কলিঙ্গা বাজারে যাইয়া পুলিশ ন্স্পেক্টারকে লইয়া ফ্রি স্কুল ষ্ট্রিট্স্থ সৈন্যবাসের অধিনায়ককে এই ংবাদ জানাইলেন। অধিনায়ক তৎক্ষণাৎ আসিয়া তুর্য্যধ্বনি দ্বারা সন্যগণকে সংযত করিলেন। এইরূপে সেই নৈশ উৎপাত বন্ধ হইল। াণী-কুঠীরের যে সকল জিনিষপত্র নষ্ট হইল সরকার তাহার ক্ষতিপূরণ করিলেন।

মকিনপুর পরগণায় রাণী রাসমণির জমিদারী ছিল। তথায় ীলকর ডোনাল্ড সাহেবের অত্যাচারে প্রজাবর্গ উৎপীড়িত ছিলেন। াণী পালোয়ানগণ দ্বারা অত্যাচারী নীলকরকে সমুচিত শাস্তি দিলেন। ডানাল্ড আদালতে মোকদ্দমা করিলেন; কিন্তু হারিয়া গেলেন। রাণী াসমণির জগন্নাথপুর তালুকের চতুর্দ্দিকেই নড়াইল জমিদার বংশের ়তিষ্ঠাতা রামরতন রায়ের জমিদারী ছিল। জমিদার রামরতন গন্নাথপুর তালুকটী স্বীয় জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করিতে সচেষ্ট হন। ই উদ্দেশ্যে তিনি প্রজাবর্গের গৃহদাহ, সর্বস্ব অপহরণ ও নরহত্যাদি মানুষিক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। রাণী রাসমণির নির্দেশে ও চেষ্টায় সেই উপদ্রব অচিরে বন্ধ হয়। ইতোমধ্যে রাণী টোনার খাল নন করাইয়া মধুমতী নদীর সহিত নবগঙ্গা সংযুক্ত করেন। উক্ত াল অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ ছিল এবং উহা খনন করাইতে প্রায় এক লক্ষ াকা ব্যয়িত হয়। এই খালের দ্বারা কৃষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা বং প্রজাবর্গ উপকৃত হয়। কীর্ত্তিমতী রাসমণির পুণ্য কীর্ত্তি বাংলার

নানা স্থানে অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হয়। তাঁহার পুণ্যকাহিনী মুখে মুখে
সমগ্র প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে।

রাণী রাসমণি ১২৬২ সালে (১৮৫৫ খ্রীঃ) দক্ষিণেশ্বরে নবর
কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করেন। কালীবাড়ীর জমিক্রয়, গৃহনির্মাণ ও
দেবোত্তর সম্পত্তি প্রভৃতির জন্য প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়
ইহাই রাণীর সর্বাপেক্ষা অক্ষয় কীর্তি। ইহার বিস্তৃত ইতিবৃত্ত পরবর্তী
অধ্যায়ে প্রদত্ত। কাশীধামে দেবীমন্দির স্থাপনার্থ তিনি একখণ্ড ভূমি
ক্রয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তথায় তৎকর্তৃক মন্দির স্থাপিত হয় নাই
তাঁহার তৃতীয় জামাতা মথুরানাথ ও চতুর্থা কন্যা জগদম্বার দ্বিতীয় পুত্র
ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস উক্ত স্থানে ১৩০০ সালের ৬ই চৈত্র (১৮৯৪ খ্রী
১৯শে মার্চ) সোমবার ত্রৈলোক্যেশ্বর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন
উহার ব্যয় নির্বাহার্থ চারি শত টাকা আয়ের সম্পত্তিও তিনি দেন
মাতার কীর্তির অনুকরণে কন্যা জগদম্বা ১২৮১ সালে ৩০শে চৈত্র
(১৮৭৫ খ্রীঃ ১২ই এপ্রিল) সোমবার তিন লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বারাকপুরের
নিকটবর্তী টিটাগড়ে গঙ্গাতীরে অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির স্থাপন করেন
রাসমণির প্রথমা কন্যা পদ্মমণির পৌত্র গোপালকৃষ্ণের সহধর্মিণী
নাম গিরিবালা দাসী। জগদম্বার ন্যায় গিরিবালাও ১৩১৮ সালে
১৮ই জ্যৈষ্ঠ (১৯১১ খ্রীঃ ১লা জুন) বৃহস্পতিবার আগড়পাড়ায় দুই
লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে রাধাকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

দক্ষিণেশ্বরে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাসমণি কালীঘাটে
বাগানবাড়ী ও পুষ্করিণী এবং আদি গঙ্গায় পাকা ঘাট নির্মাণ করান
তথায় তিনি প্রতিমায় কালীপূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন ও ব্রতদানাদি
অনুষ্ঠান করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হইবার প

ালীঘাটের উৎসবাদি বন্ধ হইয়া যায় এবং দক্ষিণেশ্বরে পূর্বপ্রচলিত ৎসব অধিকতর সমারোহে চলিতে থাকে পুণ্য কর্মে অসাধারণ ষ্ঠা থাকিলেও বৈষয়িক কর্মে তাঁহার অবহেলা ছিল না। বিষয় ম্পত্তির তত্ত্বাবধান তিনি প্রধানতঃ তৃতীয় জামাতা মথুরানাথের াহায্যে করিতেন। তাঁহার জমিদারির কাগজপত্রে যে শীলমোহরের াপ দেওয়া হইত তাহাতে লিখিত ছিল, "কালীপদ অভিলাষী ীমতী রাস ণি দাসী।" সতী সাধ্বীর ন্যায় তাঁহার দৈনন্দিন জীবন াতিবাহিত হইত। প্রত্যহ প্রত্যুষে শয্যাত্যাগপূর্বক তিনি সূর্য্যোদয় র্শন এবং পট্টবস্ত্র পরিধানান্তে গৃহদেবতা রঘুনাথজীকে প্রণামান্তে ফটিকের মালা লইয়া জপ করিতেন। অনন্তর কোন ব্রাহ্মণকে কটী মুদ্রা প্রণামী দিয়া স্বহস্তে অষ্টোত্তর শত দুর্গানাম লিখিতেন। ৎপরে প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্বক মথুরানাথ প্রমুখ জামাতাদিগের াহায্যে বিষয়-কর্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং কাগজপত্রে স্বয়ং সহি িতেন। ঐ সময় কোন দৌহিত্র দৈনিক সংবাদ-পত্র পড়িয়া তাঁহাকে নাইতেন। অতঃপর স্নানাহ্নিক সমাপন এবং দীনদরিদ্রকে বারটী দাদান এবং অপরাহ্ণে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন। সায়ংকালে বতা বন্দনার পর সমাগত পৌরবর্গের সহিত তিনি সদালাপে যুক্তা হইতেন। তাঁহার গলায় সোনার হারের সহিত মোটা লসীর মালা শোভা পাইত।

দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার পর রাসমণি প্রায়ই তথায় ইয়া থাকিতেন। বৈষ্ণব বংশে জন্ম এবং শৈব পরিবারে বিবাহ ইলেও তাঁহার ধর্মমত সমুদার ছিল। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের গান নতে সর্বাপেক্ষা ভালবাসিতেন। নিম্নলিখিত কালী-সঙ্গীত তাঁহার

অতিশয় প্রিয় ছিল। গানের লেখক অজ্ঞাত। গানটী কাফী সুরে ঠুংরী তালে গীত হয়।

কোন্ হিসাবে হর-হৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিভ্ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
জেনেছি জেনেছি তারা তারা কি তোর এমনি ধারা
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অম্‌নি করে॥

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে গান শুনিতে শুনিতে ভক্তিমতী রাসমণি অশ্রুবিসর্জন করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাঁহাকে গানের পর গান গাহিয়া শুনাইতেন। তিনি তখন কালীমাতার নিত্যপূজক। একদিন রাসমণি কালীবাড়ীতে আসিয়া গঙ্গাস্নানান্তে কালীমন্দিরে গেলেন এবং ঠাকুরকে গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। কালীপূজা সমাপনান্তে ঠাকুর ভক্তিভরে গান ধরিলেন। গান শুনিতে শুনিতে রাণী জরুরী বিষয় চিন্তায় কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হইলেন।* ইহাতে প্রমত্ত গায়ক বিরক্ত হইয়া চিন্তান্বিতা রাণীকে এক চড় মারিয়া বলিলেন, "এখানে বিষয়-চিন্তা!" ইহাতে রাণীর পরিচারিকারা হৈ চৈ করিয়া উঠিল এবং দারোয়ান ও কর্মচারীরা ছুটিয়া আসিল। রাণীর কঠোর ইঙ্গিতে গোলমাল তৎক্ষণাৎ থামিয়া গেল। রাণী স্বীয় অন্যমনস্কতার জন্য ঠাকুরের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ়

* ইহা লীলাপ্রসঙ্গকার স্বামী সারদানন্দের মত। কথামৃতকার মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন, "রাণী অন্যমনস্ক হইয়া গান শুনিতে শুনিতে ফুল বাছিতে লাগিলেন।" উভয় পুস্তকে কার্য্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও অন্যমনস্ক একমত দৃষ্ট হয়।

ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। তাঁহাকে ঠাকুরের প্রথমা শিষ্যা ও সেবিকা বলা যাইতে পারে।

অন্তিম জীবনে রাণী রাসমণি জানবাজার বাটীতে অতি অল্পই থাকিতেন এবং অধিকাংশ দিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে কাটাইতেন। কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে ১২৬৬ সালের শেষ ভাগে (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে) তিনি দুরারোগ্য গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হন। প্রথমে উচ্চ জ্বর, গাত্রবেদনা ও অজীর্ণাদি রোগ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত এবং অবশেষে গ্রহণীরোগে পরিণত হয়। অল্প কাল মধ্যে উক্ত রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করিল। রাণী শয্যাগত হইলেন। ডাক্তার কবিরাজগণও তাঁহার আরোগ্যের আশা ছাড়িয়া দিলেন। রাণী কালীঘাটে আদি গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাটীতে আসিয়া রহিলেন। কালীমন্দির প্রতিষ্ঠার প্রায় তিন মাস পরে রাণী ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দ্বারকানাথ ঠাকুরের জমিদারীভুক্ত দিনাজপুর জেলার ঠাকুর গাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণার তিন লাট জমিদারী দুই লক্ষ ছাব্বিশ হাজার মুদ্রায় ক্রয় করেন। কালীবাড়ীর সমুদয় ব্যয়নির্বাহার্থ উক্ত সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার আন্তরিক অভিপ্রায়। সুদৃঢ় সংকল্প থাকা সত্ত্বেও তিনি নানা কারণে এতদিন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। মৃত্যুকাল সমাসন্ন দেখিয়া তিনি উহা সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চারি কন্যার মধ্যে মধ্যমা কুমারী ও তৃতীয়া করুণাময়ী কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠার পূর্বেই দেহত্যাগ করেন। সুতরাং জ্যেষ্ঠা পদ্মমণি ও কনিষ্ঠা জগদম্বা কন্যাদ্বয় তাঁহার অন্তিম কালে উপস্থিত ছিলেন। শালবাড়ীর জমিদারী দেবোত্তর করিবার সম্মতিসূচক অঙ্গীকার-পত্রে জগদম্বা সহি

করিলেন, কিন্তু পদ্মমণি স্বাক্ষর দিলেন না। সেই জন্য রাণী মৃত্যুশয্যায় অস্বস্তি বোধ করেন। অগত্যা তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে দেবোত্তর দানপত্রে স্বাক্ষর দিলেন এবং পর দিন মধ্যরাত্রে দেহত্যাগপূর্বক দেবীলোকে গমন করেন।

দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে কালীঘাটে গঙ্গাগর্ভে আনয়ন করা হইল। তখন তাঁহার সম্মুখে কতকগুলি আলোক জ্বালান ছিল দেখিয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "সরিয়ে দে, সরিয়ে দে। ওসব রোস্‌নাই এখন আর ভাল লাগ্‌ছে না। এখন আমার মা (শ্রীশ্রী জগন্মাতা) আসছেন। তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারি দিক আলোকময় হয়ে উঠেছে!" কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বলিলেন, "মা এলে! পদ্মমণি যে সহি দিলে না, কি হবে মা!" ইহাই রাণীর শেষোক্তি। এই বাক্যের উত্তর প্রদানার্থই যেন শিবাকুল সেই সময় চারি দিকে উচ্চ রবে ডাকিয়া উঠিল। শেষোক্তির পরেই পুণ্যবতী রাসমণি শান্তভাবে জগদম্বার ক্রোড়ে মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করিলেন। চব্বিশ বৎসর বৈধব্য জীপন যাপনান্তর ১২৬৭ সালে ৯ই ফাল্গুন (১৮৬১ খ্রীঃ ১৯শে ফেব্রুয়ারী) মঙ্গলবার প্রায় ৬৮ বৎসর বয়সে রাণী লোকান্তরিতা হন। তাঁহার স্থুল দেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে চন্দন কাষ্ঠের চিতায় ভস্মীভূত হয়। কালীমাতার অষ্ট সখীর অন্যতমা এই ভাবে মানবীরূপে মর্ত্যধামে পুণ্যকর্মানুষ্ঠান ও কালীমাহাত্ম্য প্রচার করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর ইতিবৃত্ত

মোক্ষতীর্থ কাশীধামে যাইয়া বাবা বিশ্বনাথ এবং মাতা অন্নাপূর্ণাকে দর্শন ও পূজার বাসনা রাণী রাসমণির হৃদয়ে বহু বৎসর যাবৎ বলবতী ছিল। কিন্তু সহসা পতি-বিয়োগ হেতু জমিদারী পরিচালনার গুরুভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হওয়ায় তিনি এতকাল উক্ত বাসনা পূর্ণ করিতে পারেন নাই। এখন জামাতৃত্রয়, বিশেষতঃ কনিষ্ঠ জামাতা মথুরানাথ তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ হওয়ায় তিনি ১২৫৫ সালে কাশীযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তখন কাশী পর্য্যন্ত রেলপথ ছিল না, জলপথে নৌকায় যাইতে হইত। বহু আত্মীয়-আত্মীয়া ও কুটুম্ব-কুটুম্বিনী তাঁহার সঙ্গে কাশী যাইবার জন্য মিলিত হইলেন। পঁচিশ খানি বড় বড় বজরায় ছয় মাসের উপযোগী খাদ্যদ্রব্যাদি সজ্জিত হইল। কিন্তু যাত্রার অব্যবহিত পূর্বরাত্রে তিনি স্বপ্নে দেবীর দর্শন লাভ ও প্রত্যাদেশ পাইলেন, "কাশী যাইবার আবশ্যক নাই। ভাগীরথীতীরে মনোরম প্রদেশে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠাপূর্বক পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা কর'। আমি উক্ত মূর্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্যপূজা গ্রহণ করিব।" ভক্তিমতী রাসমণি স্বপ্নে দেব্যাদেশ পাইয়া কাশীযাত্রা বন্ধ করেন এবং মন্দির নির্মাণে মনোযোগ দেন। কেহ কেহ বলেন. রাণী কাশীযাত্রা করিয়া কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্য্যন্ত যাইয়া নৌকায় রাত্রিবাস কালে উক্ত প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন।

মথুরানাথের উপর স্থান-নির্বাচন এবং মন্দির-নির্মাণের ভার পড়িল।

বাংলায় এই প্রবাদ আছে যে, গঙ্গার পশ্চিম কূল বারাণসী সমতুল। উক্ত ধারণার বশবর্তিনী হইয়া রাণী বালি, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিলেন। কিন্তু ঐ সকল গ্রামের 'দশ আনি' ও 'ছয় আনি' নামে খ্যাত জমিদারগণ রাণীকে উচ্চ মূল্যেও জমি বিক্রয় করিতে সম্মত হইলেন না। তাঁহাদের এই গৌরব ছিল যে, স্বাধিকৃত স্থানে কোথাও অন্যের ব্যয়ে নির্মিত ঘাট দিয়া তাঁহারা গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না। বালি ও উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীন লোকেরা এখনও একথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য দান করেন। সেইজন্য রাণী বাধ্য হইয়া গঙ্গার পূর্বকূলে দক্ষিণেশ্বর গ্রামে সংকল্পিত মন্দিরের স্থান মনোনীত করিলেন। নির্বাচিত স্থানের একাংশে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ইংরাজ এটর্নি জেমস হেষ্টি সাহেবের কুঠি এবং অন্যাংশে মুসলমানদিগের কবরডাঙ্গা এবং গাজিসাহেব পীরের স্থান ছিল। ১৮৪৭ খ্রীঃ ৬ই সেপ্টেম্বর কুঠি সমেত ষাট বিঘা জমি হেষ্টি সাহেবের নিকট হইতে পঞ্চান্ন হাজার টাকা মূল্যে ক্রয় করা হইল। এই স্থানটী কুর্ম-পৃষ্ঠাকৃতি ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রমতে উক্ত প্রকার শ্মশানই দেবীপ্রতিষ্ঠার ও শক্তি সাধনার জন্য প্রশস্ত। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "রাণী যেন দৈবাধীন হইয়াই উক্ত স্থানটী মন্দির নির্মাণার্থ মনোনীত করেন।"

উক্ত স্থানের দক্ষিণে কোম্পানীর বারুদখানা, উত্তরে যদুনাথ মল্লিকের বাগিচা ও পূর্বে গঙ্গা। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর তরঙ্গাঘাত হইতে তটরক্ষার্থ নদীতল হইতে ইষ্টক-নির্মিত উচ্চ পোস্তা ও ঘাট প্রথমে বাঁধান হয়। কিন্তু পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত ঘুসুড়ির টেক হইতে আগত প্রবল বানের আঘাতে উহা শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে রাসমণি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মেকিন্টশ কোম্পানিকে এক লক্ষ ষাট হাজার

টাকার চুক্তিতে পাকা পোস্তা ও পাকা ঘাট বাঁধিবার ভার দেন। উক্ত ইংরাজ কোম্পানি কর্তৃক উভয় কার্য্য যথাসময়ে সম্পন্ন হয়। মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে প্রায় দশ বর্ষ কাল লাগিয়াছিল। নদীগর্ভ হইতে উত্থিত সোপানাবলীমণ্ডিত ঘাট মেকিণ্টশ কোম্পানি কর্তৃক নির্মিত উহা পোস্তাকে উত্তরে ও দক্ষিণে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে চাতালের পূর্বে বিস্তৃত চাঁদনি। চাঁদনির দুই দিকে ছয়টী ছয়টী করিয়া দ্বাদশ শিবমন্দির। দক্ষিণ ভাগের ছয়টী মন্দিরে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যথাক্রমে যজ্ঞেশ্বর, জলেশ্বর, জগদীশ্বর, নাগেশ্বর, নন্দীশ্বর (বা নন্দিকেশ্বর) ও নরেশ্বর শিবলিঙ্গ বিরাজিত। উত্তর ভাগের ছয়টি মন্দিরে দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে যথাক্রমে যোগেশ্বর, যত্নেশ্বর, জটিলেশ্বর, নকুলেশ্বর, নাকেশ্বর ও নির্জলেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। এই দ্বাদশ মন্দিরে শ্বেত ও কৃষ্ণ প্রস্তরমণ্ডিত মন্দিরতলে মণ্ডলাকার বেদীর উপরে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত শিবলিঙ্গ এবং শিবের পূর্ব দিকে কৃষ্ণপ্রস্তরের বৃষভ। সোপকরণ সামান্য নৈবেদ্যোপচারে দ্বাদশ শিবের নিত্য পূজা ও সান্ধ্য আরতি হয়। দেবালয় প্রতিষ্ঠা দিবসে এবং শিবরাত্রিতে দ্বাদশ শিবের বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে।

দ্বাদশ শিবমন্দিরের পূর্বদিকে টালিমণ্ডিত বিশাল অঙ্গিনা উত্তর দক্ষিণে গঙ্গাতটের সমান্তরালে বিস্তৃত। উহা দৈর্ঘ্যে ৪৪০ ফুট এবং প্রস্থে ২২০ ফুট। উহার উত্তর, দক্ষিণ ও পূব প্রান্তে তিন পংক্তি একতলা দালান এবং পশ্চিম প্রান্তে দ্বাদশ শিব মন্দিরের শ্রেণী। প্রত্যেক প্রান্তের মধ্যস্থলে বড় বড় বহির্দ্বার। উহার পশ্চিমাংশে উন্মুক্ত এবং পূর্বাংশ ব্যাপিয়া মন্দিরদ্বয় সংযুক্তভাবে অবস্থিত আঙ্গিনার পূর্ব দিকে নবচূড়ামণ্ডিত কালীমন্দির এবং তদুত্তরে বিষ্ণুমন্দির

কালীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্তির নাম ভবতারিণী। মন্দির-শিখরে প্রথমে চারিটি চূড়া বিদ্যমান। তন্মধ্যে পূর্ব-দক্ষিণ কোণস্থ চূড়াটী প্রচণ্ড ঝড়ে বক্র হইয়া যায় ; কিন্তু স্থানচ্যুত হয় নাই। দ্বিতীয় স্তরে আরও চারিটি চূড়া এবং সর্বোপরি নবম চূড়া। একদা কালীমন্দিরে বজ্রপাত হইয়াছিল। ইহার ফলে দেবীমূর্তির চারিপার্শ্বস্থ মর্মর প্রস্তরগুলি বিক্ষত ও বিদীর্ণ হয় ; কিন্তু দেবীমূর্তি অক্ষত ছিল। উক্ত দুর্ঘটনার পর মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে বজ্র-নিবারক লৌহশলাকা স্থাপিত হইয়াছে। মন্দিরতল শ্বেতকৃষ্ণ মর্মরমণ্ডিত, তদুপরি কৃষ্ণ-প্রস্তরনির্মিত দ্বিস্তবক বেদী। বেদীর উপরে রৌপ্যময় শতদল পদ্ম এবং তদুপরি শ্বেতমর্মরময় মহাকাল শায়িত। উক্ত শতদলের পরিধি প্রায় তিন হাত। মহাকালের হৃদয়োপরি ন্যস্তপদা দক্ষিণাস্যা, কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিতা, নানাভরণভূষিতা, বারাণসীচেলীপরিহিতা চতুর্ভুজা ভবতারিণী কালীমূর্তি।

ভবতারিণী দেবীর চরণে অলক্তকরাগ ও তদুপরি নূপুর গুজরী-পঞ্চম, চুট্‌কী ও পাঁজেব। কটিতটে নিমফল, পাটা ও সুবর্ণময় নরকরমালা। প্রকোষ্ঠে বালা ও নারিকেল ফুল, পৈঁচে ও বাউটি, বাহুতে তাড়, তাবিজ ও বাজু। বাম হস্তদ্বয়ে খড়্গ ও দৈত্যমুণ্ড এবং দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে বরাভয় মুদ্রা। গলদেশে চিক, মুক্তার সাতনরী, সোনার বত্রিশ নরমুণ্ডমালা, তারাহার ও সুবর্ণময় মুণ্ডমালা। নাসিকায় নথ, কানে কানবালা ও কান পাশ, ফুল ঝুম্‌কো ও চৌদানী, মস্তকে মণিখচিত সুবর্ণমুকুট। প্রতিমার পশ্চাতে রৌপ্যময়, কারুকার্য্যবিশিষ্ট ছটা এবং ঊর্ধে রজতমণ্ডিত স্তম্ভবদ্ধ রৌপ্য ফ্রেমে বহুমূল্য চন্দ্রাতপ। পদ্মাসনোপরি পশ্চিম দিকে অষ্টধাতু-নির্মিত সিংহ, পূর্বে গদিকা ও

ত্রিশূল। বেদীর পূর্ব-দক্ষিণ কোণে শিবা, দক্ষিণে রৌপ্যময় সিংহাসনে শ্রীধর ও দধিবামন শালগ্রামদ্বয়, কৃষ্ণপ্রস্তরের বৃষভ এবং উত্তর-পূর্ব কোণে শ্বেতপ্রস্তরের হংস। বেদীর নিম্নস্তবকে পিত্তল-নির্মিত সিংহাসনে সন্ন্যাসীপ্রদত্ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমপ্রিয় রামলালা নামক শ্রীরামচন্দ্র-বিগ্রহ ও বাণেশ্বর শিব এবং অপর সিংহাসনে চণ্ডীর পুঁথি। দেবীমূর্তিব সম্মুখে সিন্দুবরঞ্জিত, পুষ্পমাল্যশোভিত মঙ্গলঘট। মন্দিবমধ্যে উত্তব-পূর্ব কোণে বৌপ্যময় খাট ও তদুপবি বিচিত্র শয্যা ভবতারিণীব বিশ্রামার্থ রক্ষিত এবং রূপার বাটা, রূপার কলস, হাঁড়ী, স্থালী, গ্লাস, চামর প্রভৃতি যথানিয়মে সজ্জিত।

পাষাণময়ী ভবতাবিণী আট নয় বর্ষ বয়স্কা বালিকা মূতি। দেবীমূর্তি নির্মাণারম্ভের দিবস হইতে রাণী রাসমণি যথাশাস্ত্র কঠোর তপশ্চর্য্যা করেন। তৎকালে তিনি ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন ভোজন, ভূমিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপ-পূজাদি করিতেন। দেবীমূর্তি নির্মিত হইলে উহাকে সযত্নে বাক্সবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কয়েক দিনের মধ্যে উক্ত মূর্তি ঘামিয়া উঠে এবং রাণী স্বপ্নে পুনরায় দেবীর এই প্রত্যাদেশ পান, "আমাকে আর কত দিন এই ভাবে আবদ্ধ করে রাখবি? আমাব যে বড় কষ্ট হচ্ছে। যত শীঘ্র পারিস্ আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর।" উক্ত প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াই রাসমণি দেবীপ্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং স্নান-যাত্রা পূর্ণিমার পূর্বে অন্য কোন শুভ দিন না থাকায তিনি বিষ্ণু-পর্ব্বাহে মন্দির প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিলেন।

সন ১২৬২ সালে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার দিবস ভবতারিণী দেবী নব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা হন। মন্দির প্রতিষ্ঠায় রাসমণি মুক্তহস্ত ছিলেন। দেবালয় নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তিনি নয় লক্ষ

মুদ্রা ব্যয় করেন। প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে যাত্রাভিনয়, কালীকীর্তন, ভাগবতপাঠ, রামায়ণ কথা প্রভৃতিতে কালীবাটীতে আনন্দের প্রবাহ বহিয়াছিল। প্রতিষ্ঠা-দিবসেও 'দীয়তাং ভুজ্যতাম্' রবে কালীবাড়ী কোলাহলপূর্ণ ছিল। সেদিন রাত্রিকালেও আনন্দোৎসবের বিরাম হয় নাই এবং অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়ের সর্বত্র দিবসের ন্যায় সমুজ্জ্বল ছিল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ঐ সময়ে দেবালয় দেখিয়া মনে হইয়াছিল, রাণী যেন রজতগিরি তুলিয়া আনিয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছেন।" সুদূর কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ ও চট্টগ্রাম এবং মান্দ্রাজ, পুরী, পুনা প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থান হইতে অনেক অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আহুত হন। প্রত্যেক পণ্ডিতকে এক একখানি রেশমী কাপড় ও উত্তরীয় এবং এক একটি স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণাস্বরূপ দেওয়া হয়। সমবেত গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের সংখ্যা প্রায় এক শত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকুমার চট্টোপাধ্যায় হোম করেন।

রাণী রাসমণি ও মথুরানাথের সনির্বন্ধ অনুরোধে রামকুমার চট্টোপাধ্যায় ভবতারিণীর প্রথম পূজক পদে নিযুক্ত হন। তিনি প্রায় এক বৎসর পূজা করিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ দ্বিতীয় পূজারীর পদ গ্রহণ করেন। তিনি মাত্র দুই তিন বৎসর উভয় মন্দিরে পূজক ছিলেন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামতারক ও রামলাল যথাক্রমে পূজকপদ গ্রহণ করেন। রামলালের ভ্রাতা শিবরামও মাঝে মাঝে দেবীর পূজা করিতেন। রামলালের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার জ্যৈষ্ঠ পুত্র নকুলেশ্বর ভবতারিণীর পূজা করিতেছেন। প্রত্যুষে চারিটার সময় ভবতারিণী দেবীকে মাখন ও মিছরী ভোগ দিবার পর মঙ্গলারতি হয়। বেলা

নয়টার সময় নিত্যপূজা আরম্ভ এবং দ্বিপ্রহরের মধ্যে অন্নভোগ নিবেদন ও আরাত্রিক সমাপ্ত হয়। তৎপরে বিশ্রামার্থ মন্দিরদ্বার রুদ্ধ এবং অপরাহ্ন চারিটার সময় মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হয়। সন্ধ্যারতির সময় মৃদঙ্গ ও করতালি সহযোগে কীর্তন এবং রাত্রি নয়টার সময় শীতলারতি হইবার পর মন্দির দ্বার বন্ধ হয়। নিত্যপূজা ব্যতীত, স্নানযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রথযাত্রা, দোলপূর্ণিমা ও রাসযাত্রা প্রভৃতি পর্ব-দিনে উভয় মন্দিরে বিশেষ পূজাদি হয়।

কালীমন্দিরের দক্ষিণে সুবৃহৎ নাটমন্দির। কালীপূজা ও বিশেষ উৎসবাদির সময় এখানে নাটকাভিনয় হইয়া থাকে। উহার ছাদ ষোলটি থামের উপর সংরক্ষিত। স্তম্ভ শ্রেণীর পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্বে নাট মন্দিরের দুই পক্ষ। ১২৭০ সালে (১৮৬৩ খ্রীঃ) শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের উপদেশে মথুরানাথ এখানে অন্নমেরুর অনুষ্ঠান করেন। নাট-মন্দিরের দক্ষিণ দিকস্থ প্রাঙ্গনে ইষ্টক নির্মিত বেদীতে বলিদান স্থান। এখানে অমাবস্যায় একটী ছাগবলি হয়, এবং কালীপূজায় একাধিক বলির ব্যবস্থা আছে। নাটমন্দিরের উপর মহাদেব এবং নন্দী ও ভৃঙ্গীর মূর্তি। কালীমন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মহাদেবকে হাত যোড় করিয়া প্রণাম করিতেন, যেন তাঁহার আজ্ঞা লইয়া মন্দিরে যাইতেছেন। এই নাটমন্দিরেই তিনি সর্বসমক্ষে ভৈরবীপূজা করিয়াছিলেন।

কালীমন্দিরের উত্তরে বিষ্ণুমন্দির। প্রাঙ্গন হইতে পূর্বমুখে কতিপয় সোপান উঠিয়া এবং শ্বেত-কৃষ্ণ মর্মর মণ্ডিত প্রশস্ত দালান অতিক্রম করিয়া রাধাকান্ত ও নিস্তারিণী মন্দির দ্বারে উপনীত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে শ্বেত-মর্মর-মণ্ডিত মন্দিরতলে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্মিত

দ্বিস্তবক বেদী। বেদীর রজতময় ত্রিস্তবক সিংহাসনে কৃষ্ণপ্রস্তর গঠিত ত্রিভঙ্গ রাধাকান্ত বামে অষ্টধাতুনির্মিতা নিস্তারিণীকে লইয়া পশ্চিমাস্যে বিরাজমান। রাধাকান্তের চরণযুগল সুবর্ণ-নূপুর-শোভিত ও অলক্তক রাগরঞ্জিত। তাঁহার দক্ষিণ পদ বাম পদের উপর সংন্যস্ত ও পরিধানে রেশমী পীতবাস, প্রকোষ্ঠে সুবর্ণ বলয়, করে মোহন বাঁশী গলদেশে চাঁপকলির হার ও দুনর কণ্ঠহার, মুখে ভুবনমোহন হাসি, কানে মকর মুখ ও ঝুম্‌কো, ললাটে অলকা তিলক এবং শিরে শিখিপুচ্ছশোভিত সুবর্ণ মুকুট। নীলবসনা নিস্তারিণীর প্রকোষ্ঠে সুবর্ণ বলয় ও মুড়কি মাদুলি, বাহুতে বাজু, গলে পাঁচনর হার ও দুনর কণ্ঠহার, নাসিকায় নথ এবং মস্তকে সুবর্ণমুকুট। অষ্টধাতু নির্মিত গোপাল ও গরুড় মূর্তি যথাক্রমে রাধাকান্তের সম্মুখে ও উত্তর পশ্চিম দিকে বিরাজিত। সিংহাসন ও বেদীর স্তবকসমূহে ক্ষুদ্র রৌপ্য সিংহাসনে শালগ্রাম, ব্রজলীলার ছবি, দুই শ্বেতপ্রস্তরের বৃষ, পিত্তল সিংহাসনে গোপাল এবং নামব্রহ্ম অঙ্কিত চিত্র। মন্দির মধ্যে পূর্ব দক্ষিণ কোণে খাটের উপর শয্যা রাধাকান্তদেব ও নিস্তারিণী দেবীর বিশ্রামার্থ রক্ষিত। সম্মুখস্থ দালানে ঝাড় আলো টাঙ্গান আছে। উহা এখন আর ব্যবহৃত হয় না। এই মন্দিরে রামকৃষ্ণ প্রথম পূজারীর কার্যে ব্রতী হন ১২৬৩ সালে (১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) তৎপরে ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায় পূজার ভার গ্রহণ করেন। মন্দিরদ্বয়ে যে কারুকার্য্য দৃষ্ট হয় তাহা পুরী বা ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সহিত তুলনীয়।

দেবালয়ের উত্তরদ্বারের পূর্বদিকে অতিথিশালা। পূর্বদ্বারের উত্তর ভাগে যে ঘরগুলি আছে তাহাতে ভাণ্ডার, ভোগ-ঘর ও নৈবেদ্য

|হ। পূর্বভাগের ঘরগুলিতে দেবালয়ের কর্মচারীগণ বাস করেন। ক্ষিণ দ্বারের পশ্চিম দিকস্থ বৃহৎ ঘরটি দপ্তরখানা। এখানে খাজাঞ্চী, হুরী প্রভৃতি কর্মচারীগণ অবস্থান করেন। পূর্ব ভাগের ঘরগুলি কর্মচারীগণের ব্যবহারার্থ এবং দেবালয়ের আসবাবাদি রক্ষার্থ নির্দিষ্ট। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলা সম্বরণের পর দক্ষিণেশ্বরে যে কয়েক বৎসর তাঁহার জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তখন এই ভাগের কয়েকটি ঘরে ভাণ্ডার করা হইত। বিষ্ণুঘরের ভোগ নিরামিষ। কালীঘরের ভোগ আমিষ। দপ্তরখানার দক্ষিণে নহবৎখানা। দেবদেবীগণের মঙ্গলারতি, পূজারম্ভ, ভোগারতি, বিশ্রামের অবসান, সন্ধ্যারতি ও শয়নকালে নহবৎখানা হইতে মধুর বাদ্যধ্বনি উত্থিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ-কক্ষের উত্তরে আর একটি নহবৎখানা। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রামণি গঙ্গালাভের পূর্ব পর্য্যন্ত বাস করিতেন। চন্দ্রামণি দেবীর দেহত্যাগ হয় ১২৮২ সাল, ১৬ ফাল্গুণ (১৮৭৬ খ্রীঃ ২৭ ফেব্রুয়ারী), রবিবার ঠাকুরের জন্মতিথিতে। ঠাকুরের সহধর্মিণী সারদাদেবীও এখানে বার তের বৎসর অবস্থান করেন। সীতাদেবীর লঙ্কাবাসতুল্য সারদাদেবীর নহবৎবাস অতিশয় কষ্টকর ছিল। তিনি এখানে থাকিয়া ঠাকুরের জন্য অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতেন। এই ক্ষুদ্র কক্ষে আহার, শয়ন, রন্ধনাদি নানা কার্য্য হইত। এই নহবৎখানার উত্তরে সামান্য ব্যবধানে দুইটি বকুল বৃক্ষ অবস্থিত। উহার পশ্চিমে বকুলতলার গঙ্গাঘাট। এই ঘাটে ঠাকুরের বৃদ্ধা মাতা ১৮৭৭ খ্রীঃ গঙ্গাপ্রাপ্ত হন। দক্ষিণেশ্বর গ্রামের মেয়েরাও এই ঘাটে স্নান করেন। সারদাদেবী পার্শ্ববর্তী নহবতে অবস্থানকালে ভোররাত্রে উঠিয়া এই ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতেন। একদিন প্রত্যুষের অন্ধকারে তিনি সিঁড়ির উপর শায়িত একটি

কুমীরকে পায়ে মাড়াইতে গিয়াছিলেন, সেই সময় কুমীরটি লাফ দিয়া গঙ্গায় পড়িয়া যায়।

শিবমন্দির শ্রেণীর ঠিক উত্তরে এবং প্রাঙ্গনের উত্তর-পশ্চিম কোণে যে কক্ষ আছে তাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বাস করিতেন। উহার কক্ষতল সিমেন্ট-মণ্ডিত। উহার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যে দুইটি তক্তপোষ ও শয্যা রক্ষিত আছে, সেগুলি তিনি ব্যবহার করিতেন। ঊর্ধে শ্বেত চন্দ্রাতপের নিম্নে কাঠের ফ্রেমে আবদ্ধ মশারী।' উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি জলের জ্বালা। উক্ত কক্ষে ১৮৭২ খ্রীঃ ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রে ঠাকুর তাঁহার সহধর্মিণী সারদাদেবীকে জীবন্ত কালীমাতাজ্ঞানে পূজাপূর্বক তাঁহার চরণে রুদ্রাক্ষ জপমালা অঞ্জলি দেন। উহার পশ্চিম দ্বারের উত্তর পার্শ্বে সিঁথির কবিরাজ মহেন্দ্রনাথ পাল প্রদত্ত ষড়্‌ভুজ গৌরাঙ্গের চিত্র। দক্ষিণ পার্শ্বে যশোদা ও গোপাল প্রভৃতি বহু চিত্র। নেপাল রাজপ্রতিনিধি কর্ণেল বিশ্বনাথ উপাধ্যায় প্রদত্ত মৃন্ময় গণপতি মূর্তি উল্লিখিত দেওয়ালে রক্ষিত। পশ্চিম দেওয়ালে পাইকপাড়ার রাণী কাত্যায়নী প্রদত্ত শ্বেত প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধদেবমূর্তি এবং কেশবচন্দ্র সেন প্রদত্ত যীশু খ্রীষ্টের ছবি। পূর্ব-দক্ষিণ দ্বারের উপরে কলিকাতার সুরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রদত্ত সর্বধর্ম সমন্বয়ের ছবি এবং প্রফুল্লচন্দ্র চক্রবর্ত্তী অঙ্কিত দেওয়ালের নক্সা। এই কক্ষে ঠাকুরের শিষ্য-শিষ্যাগণ ও ভক্তবৃন্দ আসিয়া বসিতেন। ঠাকুর এবং তৎশিষ্যগণের কত ভাব ও কত সমাধি যে এই ঘরে হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার ফলে এই কক্ষটি আজ স্বর্গতুল্য শান্তিপ্রদ স্থানে পরিণত। ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি, সাদা জামা, কাল কোট ও চটিজুতা পরিয়া সাধারণ মানুষের বেশে

থাকিতেন। কিন্তু দিবারাত্রির যে কোন সময়ে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ বা ধর্ম্ম-সঙ্গীত শ্রবণমাত্র তাঁহার সমাধি হইত। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁহার নয়নযুগল পলকশূন্য হই'ত, উভয় নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু পড়িত, অধরে মৃদু হাস্য বিকশিত হইয়া ভক্তহৃদয়ে অমিয় ধারা বর্ষণ করিত, বাহ্যজ্ঞানশূন্য স্পন্দনহীন দেহ প্রস্তরবৎ স্থির নিশ্চল থাকিত এবং কর্ণে পুনঃ পুনঃ উচ্চ স্বরে প্রণব উচ্চারণ করিলে ক্রমে তাঁহার বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিত। তিনি যখন সমাধিস্থ হইতেন তখন দিব্য ভাবে এই কক্ষ জম্ জম্ করিত। এই কক্ষের পশ্চিম দিকে অর্দ্ধ-মণ্ডলাকার বারান্দা আছে। ঠাকুর তথায় দাঁড়াইয়া পশ্চিমাস্য হইয়া গঙ্গা দর্শন করিতেন। উক্ত কক্ষের উত্তরে একটা চতুষ্কোণ বারান্দা। পূর্ব্বদিকস্থ সুদীর্ঘ বারান্দাকে মধ্যবর্ত্তী দেওয়াল দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। দক্ষিণ ভাগে ঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ বা নাম সংকীর্ত্তন করিতেন। উত্তর ভাগে ভক্তগণ ঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে মিলিত হইয়া তাঁহার কথামৃত শ্রবণ ও প্রসাদ ভোজন করিতেন।* দেবালয়ের উত্তরে দ্বিতল কুঠী। রাণী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরানাথ দেবালয়ে আসিলে এই কুঠীতে থাকিতেন। তাঁহাদের জীবদ্দশায় পরমহংসদেব কিছুকাল উক্ত গৃহের নীচের তলায়

---

* ঠাকুরের প্রথম জন্মোৎসব ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় তাঁহার জীবদ্দশায় এই কালীবাড়ীতে। ঠাকুরের স্নানাদি হইলে, ১০ টার পর কীর্তন আরম্ভ হইত। ভক্তগণ ঠাকুরকে চাঁপাফুলের রঙের কাপড় পরাইতেন, তাঁহার গলায় ফুলের মালা এবং চরণে ও ললাটে সাদা চন্দন দিতেন। তখন ঠাকুর অপূর্ব শোভা ধারণ করিতেন। কীর্তনান্তে ঠাকুর ভক্তগণের সঙ্গে বসিয়া একত্রে প্রসাদ পাইতেন।

পশ্চিমের ঘরে বাস করিতেন। এই কুঠীতে একাধিকবার ঠাকুর সাহেব-ভূত দেখিয়াছিলেন।

দেবালয়ের পূর্ব দিকে একটি পুষ্করিণী। উহাতে বাসনমাজার ঘাট আছে। উক্ত পুষ্করিণীর উত্তরে যে বাঁধা ঘাট আছে তাহার পার্শ্বে গাজীতলা। গাজীতলার পার্শ্ববর্তী পথ ধরিয়া পূর্ব মুখে যাইলে কালীবাড়ীর সদর ফটক পাওয়া যায়। কলিকাতার দর্শকবৃন্দ প্রায়ই এই ফটক দিয়া কালীবাড়ীতে আসেন। কলিকাতা হইতে পরমহংসদেব যখন গভীর রাত্রে কালীবাড়ীতে ফিরিতেন তখন এই ফটকের দ্বারবান চাবি খুলিয়া দিত। ঠাকুর দ্বারবানকে ডাকিয়া ঘরে লইয়া যাইতেন এবং লুচি-মিষ্টান্নাদি প্রসাদ দিতেন। কুঠীর উত্তর দিকে যে পুষ্করিণী আছে তাহার নাম হাঁসপুকুর। উহার জলে পূর্বে সম্ভবতঃ হাঁস চরিয়া বেড়াইত। হাঁসপুকুরের উত্তর-পূর্ব কোণে আস্তাবল ও গোশালা। গোশালার পূর্ব দিকে খিড়কী ফটক। এই ফটক দিয়া দক্ষিণেশ্বর গ্রামে যাওয়া যায়। গ্রামের নরনারীরা এই ফটক দিয়া দেবালয়ে বা গঙ্গাস্নানে আসেন।

বকুলতলার উত্তরে পঞ্চবটী। পূর্বে এই স্থানে একটি আমলকী বৃক্ষ ও জঙ্গল ছিল। ঠাকুর উক্ত আমলকী বৃক্ষতলে বসিয়া সন্ধ্যার পর ধ্যান করিতেন। আমলকী বৃক্ষের পার্শ্বে অশ্বত্থ, অশোক, বিল্ব ও বটবৃক্ষ রোপণপূর্বক তিনি স্বহস্তে পঞ্চবটী প্রস্তুত করেন। পঞ্চবটীতে বৃন্দাবনের পূতরজ ছড়াইয়া এবং উহার চতুর্দিকে গোলাকার তুলসীর বেড়া এবং মধ্যস্থলে বেদী নির্মাণ করাইয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তথায় তপস্যা করিতেন। পঞ্চবটীর পূর্ব দিকে একটি পর্ণকুটীর ঠাকুরের নির্দেশে নির্মিত হয়। তথায় বসিয়া ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করিতেন এবং

শিষ্য-ভক্তগণকে সাধন করিতে বলিতেন। ইহার নাম সাধন কুটীর। ইহা উত্তর কালে ইষ্টকনির্মিত গৃহে পরিণত হইয়াছে। সাধন কুটীরের উত্তর-পশ্চিম কোণে মাধবীলতা। উক্ত লতা শ্রীরামকৃষ্ণদেব কর্তৃক বৃন্দাবন হইতে আনীত ও তথায় রোপিত হয়।

তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণান্তর ঠাকুর উক্ত কুটীরে তিন দিন নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন ছিলেন। পঞ্চবটীতলা ইষ্টকনির্মিত এবং মণ্ডলাকার বেদী দ্বারা সুশোভিত। এই বেদীর উত্তর-পশ্চিমাংশে পঞ্চমুণ্ডীর আসনে* বসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণ নানা সাধনে সিদ্ধ হন। এই আসনের উপরে অশ্বত্থ বৃক্ষের একটি ডাল ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন বটবৃক্ষ বহুকোটর বিশিষ্ট এবং নানা পক্ষী সমাকুল। পঞ্চবটীতে ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী আসন পাতিয়াছিলেন। তিনি সমাধিবান্ পরমহংস ছিলেন এবং ত্রিরাত্রির অধিক কোথাও থাকিতেন না। কিন্তু এখানে তিনি ঠাকুরের অদ্ভুত আকর্ষণে এগার মাস অবস্থান করেন। তাঁহার নিকট ঠাকুর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সেইজন্য ঠাকুরের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ অর্থাৎ রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী সঙ্ঘ পুরী সম্প্রদায়ভুক্ত। শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক স্থাপিত দশটী সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের মধ্যে পুরী সম্প্রদায় অন্যতম। শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসিগণই বৈদিক এবং বৈষ্ণব, উদাসী আদি সন্ন্যাসিগণ অবৈদিক।

পোস্তার ধারে গঙ্গাতীরে ফুলের বাগান। মল্লিকা, গোলাপ, জবা, করবী, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলগাছ এই বাগানে আছে। পঞ্চবটীর

* নরমুণ্ড, সর্পমুণ্ড, সারমেয়মুণ্ড, বৃষভমুণ্ড ও শৃগালমুণ্ড—এই পঞ্চমুণ্ডের দ্বারা যে বেদিকা নির্মিত হয়, তাহা তান্ত্রিক সাধনে প্রশস্ত। যোগিনীতন্ত্রমতে শুধু পঞ্চ নরমুণ্ডেও পঞ্চমুণ্ডাসন প্রস্তুত হইতে পারে। পঞ্চাধিক নরমুণ্ডও ব্যবহার করা যায়।

সম্মুখে বিল্ববৃক্ষ ও গুল্‌চি ফুলের গাছ। মল্লিকা, মাধবী ও গুল্‌চি ফুল শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতিশয় ভালবাসিতেন। এক সময় শ্রীরামকৃষ্ণ পূজার্থ প্রত্যহ পুষ্পচয়ন করিতেন। একদিন পঞ্চবটীর সম্মুখস্থ বিল্ববৃক্ষ হইতে তিনি বিল্বপত্র চয়ন করিতেছিলেন। বিল্বপত্র তুলিতে গিয়া গাছের ছাল খানিকটা উঠিয়া আসিল। তখন তিনি এই অলৌকিক অনুভূতি লাভ করিলেন যে, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান, তাঁহার না জানি কত কষ্ট হইল! তিনি আর বিল্বপত্র তুলিতে পারিলেন না। আর এক দিন পুষ্পচয়নের উদ্দেশ্যে তিনি বেড়াইতে ছিলেন। এমন সময় তাঁহার এই দিব্য দর্শন হইল যে, কুসুমিত বৃক্ষগুলি যেন ফুলের তোড়া এবং বিরাট শিবমূর্তির উপর শোভা পাইতেছে, যেন তাঁহারই অহর্নিশ পূজা হইতেছে। সেইদিন হইতে তিনি আর ফুল তুলিতে পারিতেন না। ফুলের মালা তাঁহার গলায় দিলেই তিনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন।

পঞ্চবটীর উত্তর-পূর্ব কোণে প্রাচীরের পার্শ্বে বেলতলা। বিল্ববৃক্ষতল ইষ্টক-বেদী-বেষ্টিত। এখানেও ত্রিমুণ্ডাসনে* বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধন করেন। ১৮৬১ খ্রীঃ গৈরিকবসনা সুপণ্ডিতা ভৈরবী ব্রাহ্মণী আসিয়া বেলতলায় ত্রিমুণ্ডাসন প্রস্তুত করিয়া ঠাকুরকে বহুবিধ তান্ত্রিক সাধন করাইলেন। বিল্বমূলে ত্রিমুণ্ডাসনে এবং পঞ্চবটীতে পঞ্চমুণ্ডাসনে বসিয়া ঠাকুর চৌষট্টিখানা তন্ত্রের প্রধান সাধনসমূহের অনুষ্ঠান করেন। সাধনান্তে আসনদ্বয় ভাঙ্গিয়া তিনি মুণ্ডকঙ্কালরাশি গঙ্গাগর্ভে ফেলিয়া দেন। কালীবাড়ীতে সদাব্রত ছিল, এখনও আছে। তখন কত সাধু-সন্ন্যাসী, যোগী, ফকির, বৈষ্ণব, সাধক ও পরমহংস

---

* তিনটী নরমুণ্ডে নির্মিত আসন। মুণ্ড বলিতে মুণ্ড-কঙ্কাল বুঝিতে হইবে।

তথায় আসিয়া থাকিতেন। একদিন কোন সিদ্ধ সাধক আসিয়া কালীমন্দিরে এমন ভক্তিভরে স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন যে, কালী-মন্দির যেন কম্পিত হইল। দেবমানবের অবস্থানকালে কালীবাড়ী কৈলাসতুল্য তীর্থক্ষেত্রে ও সন্তপুরীতে পরিণত হইয়াছিল।

কালীবাড়ীর জন্য যে দেবোত্তর সম্পত্তি রাণী রাসমণি রাখিয়া গিয়াছেন উহার বার্ষিক আয় ছিল ৬৫০০০·০০ টাকা। তন্মধ্যে সরকারী খাজনা ২২০০০·০০ টাকা, রোডশেশ ৫০০০·০০ টাকা ও অন্যান্য ব্যয় ৪০০০·০০ টাকা বাদে বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ৩৪০০০·০০ টাকা। ইহার মধ্যে দেবালয়ের জন্য বার্ষিক প্রায় ১২০০০·০০ টাকা ব্যয় করা হইত। এখন দেবোত্তর সম্পত্তি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহার আয় হ্রাস পাইয়াছে। দেবালয়ের কার্য নির্বাহার্থ প্রায় পঞ্চাশ জন কর্মচারী নিযুক্ত ছিল।—ভবতারিণীর পূজক, রাধাকান্তের পূজক, তিন-জন শিব পূজক, খাজাঞ্জী ও তাঁহার সরকারী, মুহুরী, ভাণ্ডারী, তিনটি পাচক ব্রাহ্মণ, চারিজন টহলদার, তিন জন কীর্তনীয়া, ফরাস, মালাকর, কর্মকার, নাপিত, ছয়জন দারোয়ান, পাঁচজন মালী, চারিজন নহবত-ওয়ালা, ছয়জন পরিচারক ও পরিচারিকা, দুইজন ভারি, গাজী সাহেবের পরিচারিকা, রাজমিস্ত্রী, রজক, ঝাড়ুদার, ভিস্তি, মেথর ও মুদ্দফরাস। রাণী রাসমণির কুলপুরোহিতের বংশধরত্রয় শিবমন্দিরের পূজারী। তাঁহারা কালীবাড়ীর বেতনভোগী কর্মচারী নহেন। অন্যান্য কর্মচারীদের বার্ষিক বেতন বাবদ তখন তিন হাজার টাকা ব্যয় হইত। পর্বোপলক্ষে বিশেষ ব্যয় নির্দিষ্ট ছিল। কর্মচারীদের বেতন কালীবাড়ীর জমির খাজনা প্রভৃতি বাদে বার্ষিক প্রায় সাড়ে সাত হাজার টাকায় কালীবাড়ীর ব্যয় নির্বাহিত হইত।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অবস্থানকালে কালীবাড়ীর তত্ত্বাবধান করিতেন মথুরানাথ বিশ্বাস। রাসমণির দেহত্যাগের পর এবং মথুরানাথের আমলেই রাসমণির জ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণি বৎসরাধিক সেবায়েত ছিলেন। রাসমণির উইলের সর্ত অনুসারে বড় ছেলে বা বড় মেয়ে সেবায়েত হইবার অধিকারী। পদ্মমণির পরে পুনরায় মথুরানাথ সেবায়েত হন। ১৮৬১ খ্রীঃ জুলাই মাসে মথুরানাথ পরলোক গমন করেন। তৎপরে তাঁহার ধর্মপত্নী জগদম্বা পাঁচ সাত বৎসর সেবায়েত ছিলেন। জগদম্বার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাসের হস্তে দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের ভার পড়িল। ত্রৈলোক্যনাথ প্রায় ত্রিশ বৎসর কালী-বাড়ীর সেবায়েত ছিলেন। তিনি যখন সেবাধিকার লাভ করেন তখনো শ্রীরামকৃষ্ণদেব কালীবাড়ীতে থাকিতেন। ত্রৈলোক্যনাথের এক কন্যার পাদপূজার অপরাধে হৃদয়রাম কর্মচ্যুত ও বিতাড়িত হন। হৃদয়রামকে কালীবাড়ী ত্যাগের নির্দেশ দানকালে ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া রাগের মাথায় অন্যের নিকট বলিয়াছিলেন, "এঁরও আর এখানে থাকিবার আবশ্যকতা নাই। ইনি ত চলে গেলেই পারেন!" ঠাকুরের কাণে এই কথা উঠিবামাত্র তিনি হাসিতে হাসিতে তন্মুহূর্তেই চটি জুতা পায়ে দিয়া এবং গামছা কাঁধে ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। তিনি প্রায় সদর ফটক পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছেন, এমন সময় ত্রৈলোক্যনাথ অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হইয়া স্বয়ং তাঁহার কাছে যাইয়া ফিরিয়া আসিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন "বাবা, আপনাকে ত আমি যাইতে বলি নাই। আপনি কেন যাইতে-ছেন?" ইহাতে নিরভিমান পরমহংস যেন কিছুই হয় নাই, এরূপ ভাবে হাসিতে হাসিতে স্বকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন এবং কালীবাড়ীতে পূর্ববৎ

রহিলেন। রাসমণি ও মথুরানাথ নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছিলেন যে, ঠাকুর আজীবন কালীমন্দিরে থাকিতে পারিবেন এবং যতদিন থাকিবেন ততদিন পূর্ববৎ মাহিনা পাইবেন। ত্রৈলোক্যনাথ "নব্য ভারত" পত্রিকায় (৩০শ খণ্ড, ২য় ও ৩য় সংখ্যা) ঠাকুরের পুণ্য স্মৃতি লিখিয়াছিলেন। তিনি ১৯০৪ খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে দেহত্যাগ করেন।

তৎপরে তদীয় পুত্র ব্রজগোপাল বিশ্বাস কালীবাড়ীর সেবায়েত হন। তিনি মাত্র সাত মাস স্বীয় কর্তব্য পালনান্তে দেহত্যাগ করেন। তৎপরে পদ্মমণির পুত্র বলরাম এবং দ্বারিকানাথের পুত্র গুরুদাস এবং রাসমণির দ্বিতীয়া কন্যা কুমারীর পুত্র চণ্ডীচরণ সেবায়েত হইবার জন্য মোকদ্দমা করেন। বলরাম বাবু কৃষ্ণভক্ত ছিলেন। তিনি কালীমন্দিরে বলিপ্রথা তুলিয়া দেন এবং বলিস্থানে তুলসীবৃক্ষ রোপণ করেন। মোকদ্দমার ফলে দেবোত্তর সম্পত্তি দীর্ঘকাল সরকারী তত্ত্বাবধানে যায় এবং শ্রী পি. চৌধুরী রিসিভার নিযুক্ত হন। শ্রী পি. চৌধুরী প্রায় আঠার বৎসর রিসিভার ছিলেন। তাঁহার সময় কালীবাড়ীর দেড় লক্ষ টাকা ঋণ হয়। তৎপরে ১৯২৩ খ্রীঃ শ্রীকিরণ চন্দ্র দত্ত নূতন রিসিভার হন। শ্রীকিরণ দত্তের আমলে কালীবাড়ীর অর্ধেক ঋণ শোধিত এবং কালীবাড়ীর আর্থিক অবস্থা উন্নত হয়। তৎপরে রাণী রাসমণির দৌহিত্রবৃন্দের বংশধরগণ সুযোগ্য উত্তরাধিকারিগণকে লইয়া একটি ট্রাস্ট-বোর্ড গঠন করিয়াছেন। এই বোর্ড কর্তৃক অধুনা কালীবাড়ী পরিচালিত হয়। গত কয়েক বৎসর যাবৎ ১লা জানুয়ারী দিবসে কালীবাড়ীতে বিরাট কল্পতরু উৎসব হইয়া আসিতেছে।

———

তৃতীয় অধ্যায়

মথুরানাথ বিশ্বাসের সেবা ও ভক্তি

রাণী রাসমণির চারিটী কন্যা ছিল। প্রথমা কন্যা পদ্মমণির সহিত সিঁতির রামচন্দ্র আটার (দাসের) ১৮১৮ খ্রীঃ এবং দ্বিতীয়া কন্যা কুমারীর সহিত প্যারীমোহন চৌধুরীর বিবাহ হয়। তৃতীয় কন্যা করুণাময়ীর সহিত মথুরানাথ বিবাহিত হন। ১৮৩১ খ্রীঃ করুণাময়ী একটী মাত্র পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। ১৮৩২ খ্রীঃ কনিষ্ঠা কন্যা জগদম্বাকে মথুরানাথ বিবাহ করেন। রাণীর জামাতৃত্রয় জানবাজার বাটীতেই থাকিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে মথুরানাথই সর্বাপেক্ষা কর্মক্ষম, বুদ্ধিমান্ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। তিনি স্বীয় বুদ্ধি-বলে ও কর্মকুশলতায় রাণীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শুধু তাহাই নহে, তিনি ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম ভক্ত এবং প্রধান রসদ্দার। ঠাকুরের প্রার্থনায় চিন্ময়ী জগদম্বা তাঁহার চারিজন রসদ্দার নিযুক্ত করেন। জগদম্বা ঠাকুরকে দেখাইয়া দেন যে, মথুরানাথই তাঁহার প্রথম রসদ্দার।* কারণ ১২৬২ সালে (১৮৫৫ খ্রীঃ) দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমনের সময় হইতে সাধনাবস্থা শেষ হইবার কিছু-কাল পর পর্য্যন্ত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া মথুরানাথ ঠাকুরের সভক্তি সেবায় ব্যাপৃত ছিলেন। স্বামী সারদানন্দ বলেন, রসদ্দারগণ মহাভাগ্যবান্ ও জগদম্বার চিহ্নিত ব্যক্তি।

---

* যাঁহারা রসদ্ (খাদ্যাদি) যোগাইতেন ঠাকুরকে।

খুলনা জেলার অন্তর্গত সাতক্ষীরার নিকটস্থ সোনাবেড়ে নামক গ্রামে মথুরানাথের জন্মস্থান ছিল। দরিদ্রের ঘরে তাঁহার জন্ম হয় এবং রূপবান্ দেখিয়াই রাসমণি তাঁহাকে স্বীয়া কন্যার সহিত বিবাহ দেন। বিবাহের পরে তাঁহার অবস্থা ভাল হয়। ১২৭৬।৭৭ সালে মথুরানাথ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও হৃদয়রামকে সঙ্গে লইয়া পৈতৃক ভিটা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। যাইবার কালে তিনি স্বয়ং হস্তীপৃষ্ঠে গমন করেন এবং ঠাকুরকে শিবিকায় লইয়া যান। সোনাবেড়ে গ্রামে পৌঁছিবার পরে ঠাকুরের কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে কখনো কখনো হস্তীপৃষ্ঠে চড়ান হইত। সোনাবেড়ের সন্নিহিত গ্রামসমূহ তখন মথুরানাথের জমিদারীভুক্ত ছিল। অদূরবর্তী তালমাগ্রো গ্রামে মথুরানাথের কুলগুরুবংশীয়গণ বাস করিতেন। বিষয়-সম্পত্তির বিভাগ লইয়া তাঁহাদের মধ্যে যে বিবাদ চলিতেছিল তাহা মিটাইবার জন্যই তাঁহারা মথুরানাথকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে মথুরানাথ ঠাকুরকে লইয়া সোনাবেড়ে ও তালমাগ্রো প্রভৃতি গ্রামে গমন করেন। মথুরানাথের গুরুবংশীয়গণের সযত্ন পরিচর্যায় কয়েক সপ্তাহ তথায় কাটাইয়া ঠাকুর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসেন। ভ্রাতুষ্পুত্র স্নেহাস্পদ অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুরের যে মনোকষ্ট হইয়াছিল তাহা উক্ত ভ্রমণে দূরীভূত হয়। মথুরানাথ তাঁহার জমিদারী মহল পরিদর্শনে যাইলে ঠাকুর কখনো কখনো তাঁহার সঙ্গে গমন করিতেন। মথুরানাথ ভক্তিবশতঃ ঠাকুরকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন এবং তাঁহার আদেশ সর্বদা শিরোধার্য্য করিতেন।

প্রথম দর্শন হইতেই মথুরানাথ ঠাকুরের প্রতি অদম্য অব্যক্ত আকর্ষণ অনুভব করেন। তিনি তাঁহাকে সর্বপ্রথমে ভবতারিণী দেবীর

বেশকারীর পদে নিযুক্ত করিবার সংকল্প করিয়া তদগ্রজ রামকুমারের নিকট উক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। রামকুমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা বলিয়া মথুরানাথকে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু মথুরানাথ সহজে নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি স্বীয় সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। অনতিবিলম্বে আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ উপস্থিত হইল। ঠাকুর বাল্যকাল হইতে দেবমূর্তি গঠনে সুদক্ষ ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান কালে একদিন তাঁহার ইচ্ছা হইল, শিবমূর্তি গড়িয়া পূজা করিবার। মনে ইচ্ছা উদিত হইবামাত্র তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে মৃত্তিকা আনিয়া একটি সুন্দর শিবমূর্তি গড়িলেন। মূর্তিতে বৃষভ ডমরু ও ত্রিশূলাদি গঠিত ছিল। মূর্তি গঠনান্তে তিনি ভক্তিভরে শিবপূজায় নিমগ্ন হইলেন। কালীবাড়ীতে সেদিন ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে থুরানাথ তথায় আসিয়া ঠাকুরকে পূজামগ্ন দেখিলেন এবং দেবভাবাঙ্কিত শিবমূর্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। অনুসন্ধানের ফলে তিনি হৃদয়রামের নিকট জানিলেন, উক্ত মূর্তি ঠাকুর কর্তৃক নির্মিত এবং ঠাকুর দেবমূর্তি গড়িতে ও জুড়িতে সিদ্ধহস্ত। পূজা শেষে তিনি শিবমূর্তিটী হৃদয় দ্বারা আনাইলেন এবং উহা নিরীক্ষণপূর্বক মুগ্ধ হইলেন এবং রাণী রাসমণিকে উহা দেখিতে পাঠাইলেন। রাণীও মূর্তিটী দেখিয়া মথুরানাথের ন্যায় উহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

ঠাকুরকে দেবালয়ের কার্য্যে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা মথুরানাথের হৃদয়ে ইতোপূর্বে বিদ্যমান ছিল। এখন তাঁহার অভিনব গুণপনার পরিচয় পাইয়া সেই ইচ্ছা আরো বলবতী হইল। ঠাকুর অগ্রজের নিকট হইতে পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন মথুরানাথের উক্ত ইচ্ছার

কথা। কিন্তু 'ভগবান ভিন্ন অন্য কাহারো চাকুরি করিব না'—এই সংকল্প বাল্যকাল হইতে তাঁহার অন্তরে দৃঢ়বদ্ধ থাকায় অগ্রজের কথায় তিনি কর্ণপাত করেন নাই। কালীবাড়ীতে দুই তিন মাস থাকার পর স্থানটী মনোরম ও সাধনানুকুল প্রতীত হওয়ায় তাঁহার মনোভাব ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইল। একদিন মথুরানাথ কালী-বাড়ীতে আসিয়া ঠাকুরকে ডাকাইলেন এবং কালীমন্দিরে বেশকারীর কার্য্যভার লইতে তাঁহাকে স্বয়ং অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর মথুরানাথের অনুরোধে উক্ত কার্য্য করিতে সম্মত হইলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় দেবালয় প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই ঠাকুর উক্ত কর্মের ভার লইলেন।

রাধাগোবিন্দজীর মূর্তিদ্বয় রাত্রিতে ও মধ্যাহ্নে পার্শ্ববর্তী শয়নকক্ষে বিশ্রামার্থ রক্ষিত হইত। ১২৬২ সালে ভাদ্র মাসে নন্দোৎসবের দিবস পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পূজাভোগাদির পর গোবিন্দজীর মূর্তি মন্দিরস্থ সিংহাসন হইতে লইয়া শয়ন-কক্ষে যাইবার সময় পা পিছলাইয়া পড়িয়া যান এবং তাহাতে মূর্তির একটী পা ভাঙ্গিয়া যায়। ইহাতে দেবালয়ে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। কর্তব্য নির্ধারণের জন্য সহরের পণ্ডিতগণকে আহ্বানপূর্বক সভা করা হইল। স্মৃতিশাস্ত্রমতে পণ্ডিতগণ বিধান দিলেন, "ভগ্ন মূর্তি গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত এবং তৎস্থলে নূতন মূর্তি গঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হউক।" গোবিন্দজীর নূতন বিগ্রহ গড়িবার জন্য উপযুক্ত কারিগরকে আদেশ দেওয়া হইল।

সভাভঙ্গ হইলে মথুরানাথ রাণীমাতাকে বলিলেন, "বাবাকে ত এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। বাবা* কি বলেন জানিতে হইবে।"

---

* মথুরানাথ ঠাকুরকে প্রথমে 'ছোট ভট্টাচার্য্য' বলিয়া ডাকিতেন।

এই বলিয়া তিনি ঠাকুরকে উক্ত বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন তদুত্তরে ঠাকুর ভাবমুখে বলিলেন, "রাণীর জামাইদের মধ্যে কেউ যা পড়ে পা ভেঙ্গে ফেল্‌ত তবে কি তাকে ফেলে দিয়ে আর একজনবে এনে তার জায়গায় বসান হত ? না, তার চিকিৎসার ব্যবস্থা কর হত। এখানেও সেই রকম করা হোক্। মূর্তিটী জুড়ে যেমন পূজ হচ্ছে তেমন পূজা করা হোক্। ভগ্ন মূর্তি ফেলে দিতে হবে কিসে জন্য ?" এই সহজ সন্তোষজনক ব্যবস্থা শুনিয়া রাণীমাতা মথুরানাথ উভয়ে আনন্দিত হইলেন। ঠাকুরের পরামর্শ অনুসা বিগ্রহের ভগ্নাংশ জুড়িয়া পূজা চলিতে লাগিল। মথুরানাথের অনুরো ঠাকুর স্বয়ং উক্ত বিগ্রহ এমন ভাবে জুড়িয়া দিলেন যে, বিশে নিরীক্ষণ করিয়াও বোঝা যাইত না, ইহা কোন কালে ভগ্ন হইয়াছিল কারিগর নূতন মূর্তি গড়িয়া আনিলে উহা মন্দির মধ্যে এক পা রাখিয়া দেওয়া হইল, উহা প্রতিষ্ঠিত হইল না। রাসমণি মথুরানাথ লোকান্তরিত হইবার পর তাঁহাদের বংশধরগণের কেহ কে নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন কোন সাংসারিক বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় প্রতিষ্ঠা-কার্য্য অনির্দিষ্ট কালে জন্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হন। মূর্তিভঙ্গ সম্বন্ধে ঠাকুরের আ একটী মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বরাহনগরে রতন রায়ের ঘাটে নিকটে দশমহাবিদ্যার মন্দির বিদ্যমান। একদা উক্ত মন্দি পূজাদির সুবন্দোবস্ত ছিল। কিন্তু ঠাকুরের সাধন কালে উহা হীনদশ

পরে শ্রদ্ধাভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে "বাবা" বলিতেন। তখন কাল বাড়ীতে সকলে ঠাকুরকে 'ছোট ভট্টচার্য্য এবং তাঁহার দাদা রামকুমারকে "ব ভট্টাচার্য্য" বলিয়া ডাকিতেন।

প্রাপ্ত হয়! ঠাকুর মথুরানাথকে বলিয়া এই মন্দিরে মাসিক দুই মন চাউল ও দুই টাকা দানের ব্যবস্থা করেন। তদবধি তিনি তথায় মধ্যে মধ্যে দশমহাবিদ্যা মূর্তি-দর্শনে যাইতেন। একদিন উক্ত মন্দির হইতে ফিরিবার কালে স্থানীয় প্রসিদ্ধ জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়। জয়নারায়ণ ঠাকুরের সহিত পূর্বপরিচিত ছিলেন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, ওখানকার গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "তোমার কি বুদ্ধি গো? অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি কখন ভাঙ্গা হন?" নিরর্থক আলোচনা এড়াইয়া ঠাকুর তাঁহাকে উপদেশ দেন, সকল বস্তুর অসার ভাগ ছাড়িয়া সার ভাগ লইতে। সে যাহা হউক, পূজক ক্ষেত্রনাথ অনবধানতার অপরাধে কর্মচ্যুত হন। তদবধি রাধাগোবিন্দজীর পূজার ভার ঠাকুরের উপর ন্যস্ত হইল। রাধাকান্তজীর গয়না যখন চুরি গেল তখন মথুরানাথ মন্দিরে যাইয়া দেবতাকে বলিলেন, "ছি ঠাকুর! তুমি তোমার গয়না রক্ষা করতে পারলে না?" ইহা শুনিয়া ঠাকুর বিরক্ত হইয়া মথুরানাথকে বলিলেন, "ও তোমার কি বুদ্ধি! স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহার দাসী ও পদসেবা করেন তাঁর কি ঐশ্বর্য্যের অভাব? এ গয়না তোমার পক্ষেই ভারী একটা জিনিষ। কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে ও কতকগুলো মাটীর ড্যালা।"

মথুরানাথের সঙ্গে ঠাকুর একবার রাণাঘাটের নিকটে কলাইঘাট গ্রামে গিয়াছিলেন। উক্ত গ্রাম মরথুনাথের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তথায় ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া তিনি নৌকায় চড়িয়া চুর্ণীর খালে বেড়াইয়াছিলেন। সেই গ্রামবাসী নরনারীগণের দুঃখ এবং দুর্দশা দেখিয়া

ঠাকুর দুঃখিত হন এবং তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া মথুরানাথের দ্বারা প্রত্যেককে একমাথা তেল, একখানি নূতন কাপড় এবং পেট ভরিয়া ভোজন দান করান। সম্ভবতঃ ১২৭৪ সালে ঠাকুরের হৃদয়ে নবদ্বীপ দর্শনের অভিলাষ জাগ্রত হয়। মথুরানাথ তখন বজরায় তাঁহার 'বাবা'কে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপ, কাল্না প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। সাধন কালের প্রথম চারি বৎসরের মধ্যে এক সময় রাণী রাসমণি ও মথুরানাথ ভাবিয়াছিলেন যে, অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালনের ফলে ঠাকুরের মস্তিস্ক বিকৃত এবং সেই বিকৃত ভাবই আধ্যাত্মিকতারূপে প্রকাশিত। ব্রহ্মচর্য-ভঙ্গ হইলে ঠাকুরের পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ হইবে মনে করিয়া তাঁহারা লছ্মী বাঈ প্রভৃতি সুন্দরী বারবণিতাগণকে দক্ষিণেশ্বরে আনাইয়া ঠাকুরকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফলোদয় না হওয়ায় তাঁহারা কলিকাতার মেছুয়া-বাজার পল্লীতে এক বারনারীভবনে তাঁহাকে লইয়া যান। ঠাকুর উক্ত স্থানে পতিতা নারীদের মধ্যে জগন্মাতাকে দেখিতে পান এবং 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে সমাধিস্থ হন। তখন তাঁহার জননেন্দ্রিয় সঙ্কুচিত হইয়া কূর্মাঙ্গের ন্যায় দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল! এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া এবং ঠাকুরের শিশুভাবে বিমুগ্ধ হইয়া পতিতাগণ মাতৃভাবে অভিভূত হয়। তাহারা ঠাকুরকে প্রলোভিত করিবার জন্য অপরাধিনী ভাবিয়া সজল-নয়নে প্রণামপূর্বক তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। রাসমণি ও মথুরানাথ উক্ত ঘটনা হইতে নিঃশংসয়ে বুঝিলেন, ঠাকুর কামগন্ধহীন এবং দেবভাবের বিমূর্ত প্রতীক। তখন হইতে ঠাকুরের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা শত গুণে বর্ধিত হয়।

মথুরানাথ সন ১২৭৪ সালের ১৪ই মাঘ (১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ানুয়ারী) সোমবার তাঁহার পরিবারবর্গ ও গুরুপুত্রাদি শতাধিক ্যক্তি লইয়া কাশী, বৃন্দাবন, প্রয়াগাদি পুণ্য তীর্থসমূহ দর্শনে বহির্গত ন। মথুরানাথ ও তাঁহার পত্নী জগদম্বা ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া াইবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করেন। ইহার ফলে ঠাকুর স্বীয় দ্ধা জননী ও ভাগিনেয় হৃদয়রামকে লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে গমন রেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি গাড়ী রলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে রিজার্ভ করা হইল। ৺বাবা বৈদ্যনাথজীকে দর্শন-পূজাদি করিবার জন্য মথুরানাথ দেওঘরে কয়েক দিন অবস্থান করেন। উক্ত তীর্থের কোন পল্লীর নরনারীগণের দুঃখ-দৈন্য দেখিয়া ঠাকুরের কোমল হৃদয় করুণায় বিগলিত হয়। তিনি মথুরানাথকে বলেন, "তুমি ত মায়ের দেওয়ান। এদের এক মাথা করে তেল এবং একখানা করে কাপড় দাও। আর পেট ভরে একদিন এদের খেতে দাও।" মথুরানাথ প্রথমে কিঞ্চিৎ অসম্মত হইয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে। এরা অনেকগুলি লোক। এদের খাওয়ালে ও কাপড় দিলে তীর্থযাত্রার অর্থাভাব হতে পারে। এ অবস্থায় কি করা যায় ?" পল্লীবাসীদের দারুণ দারিদ্র্য দেখিয়া ঠাকুর কাঁদিতে ছিলেন এবং মথুরানাথের কথা শুনিয়া বলিলেন, "তোর সঙ্গে কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব। এদের কেউ নই, আমি এদের ছেড়ে যাব না।" এই বলিয়া তিনি বালকের ন্যায় গাঁ ধরিয়া দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া বসিয়া পড়িলেন! অগত্যা মথুরানাথ কলিকাতা হইতে কাপড়াদি আনাইয়া 'বাবা'র কথামত সকল কার্য্য করিলেন এবং পরে কাশীতে গেলেন। কাশীর সন্নিকটে কোন স্থানে

গাড়ী হইতে নামিয়া ঠাকুর এবং হৃদয়রাম উঠিতে না উঠিতেই গাড় ছাড়িয়া দিল। মথুরানাথ চিন্তিত হইয়া কাশী হইতে তার করিলে তাঁহাদিগকে পরবর্তী গাড়ীতে পাঠাইয়া দিবার জন্য। কিন্তু পরবর্ত গাড়ীর জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। রেলওে কোম্পানির বিশিষ্ট কর্মচারী রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কার্যো তত্ত্বাবধানার্থ স্বল্পক্ষণ পরে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে বিপ দেখেন এবং নিজ স্পেশ্যাল গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া কাশীধাে নামাইয়া দেন। যিনি ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন তি অচিরে বিপদমুক্ত হন।

মোক্ষতীর্থ কাশীধামে মথুরানাথ কেদারঘাটের উপরে পাশাপাশি দুইখানি ঘর ভাড়া লইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের নির্দেশে তথায় অন্নমে প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করেন। শোনা যায়, কাশীে মথুরানাথ ঠাকুরকে লইয়া বাপুলি রাজা বাবুর বাড়ীতে কয়দিন ছিলেন একদিন তাঁহাদের বৈঠকখানায় মথুরানাথ রাজা বাবুদের সহিত বসিয় আছেন এবং তন্মধ্যে ঠাকুরও ছিলেন। সকলে বিষয়-কথা বলিতেছে শুনিয়া ঠাকুর কাঁদিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, "মা, কোথায় আন্লে আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম। তীর্থ করতে এসে সেই বিষয়-কথা!" তথায় রাজা বাবুদের অনুরোধে ঠাকুর যে হাতী দাঁতের খড়ম পায়ে দিয়েছিলেন তাহা অদ্যাপি সুরক্ষিত আছে ১৯৫১ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী কল্পতরু উৎসব দিবসে উক্ত খড়ম জোড়াটি দক্ষিণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডলে সর্বজনসমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল কাশী হইতে প্রয়াগ ও বৃন্দাবন দর্শন করিয়া ঠাকুর আনন্দিত হন। কাশীধামে ত্রৈলঙ্গ স্বামী এবং বৃন্দাবনে গঙ্গামাতার সহিত ঠাকুরে

াক্ষাৎ হয়। গয়াধাম দর্শনের ইচ্ছাও মথুরানাথের অন্তরে ছিল। কিন্তু ইহাতে ঠাকুরের প্রবল আপত্তি থাকায় তাঁহারা কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। মথুরানাথের সঙ্গে এইরূপে চারি মাস কাল তীর্থ ভ্রমণান্তে ঠাকুর ১২৭৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্য ভাগে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করেন। তিনি বৃন্দাবন ধামস্থ রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের য রজঃ আনিয়াছিলেন উহার কিয়দংশ দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেন এবং অবশিষ্ট অংশ স্বীয় সাধন-কুটীর মধ্যে প্রোথিত করিয়া বলিয়াছিলেন, "আজ হইতে এই স্থল শ্রীবৃন্দাবনতুল্য দেবভূমি হইল।" উহার অনতিকাল পরে তিনি নানা স্থানের বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তগণকে মথুরানাথের দ্বারা নিমন্ত্রিত করাইয়া আনিয়া পঞ্চবটীতে মহোৎসবের আয়োজন করেন। মথুরানাথ তখন গোস্বামীদিগের প্রত্যেককে ষোল টাকা এবং প্রত্যেক বৈষ্ণব ভক্তকে এক এক টাকা করিয়া দক্ষিণা দেন।

ঠাকুরের গুরুভাব রাসমণি ও মথুরানাথের সমক্ষেই প্রথম প্রকটিত হয়। উহার ভাবী সুষমার কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াই মথুরানাথ তাঁহার প্রথম রক্ষক, সহায়ক ও সেবক হন। রাসমণি যেমন ভাগবত প্রেরণায় ঠাকুরের মহত্ত্ব বিকাশোপযোগী দেবালয় নির্মাণ করেন তদ্রূপ তাঁহার জামাতা মথুরানাথও ঐশী ইঙ্গিতে ঠাকুরের দিব্য ভাব বিকাশের প্রধান সহায়ক হন। ঠাকুর যখন বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক অহৈতুকী ভক্তির আতিশয্যে অদ্ভুত আচরণ করিতে লাগিলেন তাহা কালীবাড়ীর খাজাঞ্চী প্রভৃতি কর্মচারীগণের নিকট বিসদৃশ লাগিল। তাঁহারা মথুরানাথের নিকট অভিযোগ করিলেন; কিন্তু মথুরানাথ তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি গোপনে কালীবাড়ীতে আসিয়া

ঠাকুরের কার্যকলাপ তন্ন তন্ন ভাবে নিরীক্ষণ করিলেন ও বুঝিলেন, ছো
ভট্টাচার্য্য মহাশয় অলৌকিক অনুরাগ ও ব্যাকুলতার বশেই এইরূ
আচরণ করিয়া থাকেন। তিনি দেখিলেন, পূজাকালে কালীমন্দি
দেবীর আবির্ভাবে সত্যই জম্ জম্ করিতেছে। অনন্তর তিনি ভবতারি
দেবী এবং তাঁহার প্রমত্ত পূজককে দূর হইতে পুনঃ পুনঃ প্রণতিপূর্ব
বলিতে লাগিলেন, "এত দিনের পর দেবী প্রতিষ্ঠা সার্থক হইল
এতদিন পরে শ্রীশ্রীজগন্মাতা সত্য সত্যই আবির্ভূতা হইলেন। এত
দিনে মায়ের পূজা ঠিক্ ঠিক্ সম্পন্ন হইল।" কর্মচারীদিগের কাহাকে
কিছু না বলিয়া তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরদি
কালীবাড়ীর প্রধান কর্মচারীর নিকট এই নির্দেশ আসিল, "ভট্টাচার্য
মশায় যে ভাবেই পূজা করুন না কেন, তাঁহাকে বাধা দিবে না।
তিনি ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ যতই দেখিতে লাগিলেন ততই ঠাকুরে
প্রতি তাঁহার বিশ্বাস-ভক্তি বাড়িয়া গেল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু কলেজে মথুরানাথের সহপাঠী ছিলেন
তিনি ব্রহ্মচিন্তা করেন শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে দেখিতে উৎসুক হন
মথুরানাথ ঠাকুরকে মহর্ষির নিকট লইয়া যান। ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথকে
দেখিয়া আনন্দিত হন এবং তাঁহাকে বলেন, "তুমি কলির জনক
জনক এদিক ওদিক (যোগ ও ভোগ) দুদিক রেখে খেয়েছিল দুধের
বাটী।" আবার মহর্ষির অভিমান দেখিয়া ঠাকুর মথুরানাথকে বলেন
"আচ্ছা, অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে হয়? যার ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে
তার কি অভিমান হয়?" ঠাকুরের অনুরোধে দেবেন্দ্রনাথ বেদোক্ত
ব্রহ্মতত্ত্ব বিবৃত করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, "বেদমতে
এই জগৎ একটি ঝাড়ের আলোর মত। আর জীব হয়েছে ঝাড়ের

্রক একটি দীপ।” ঠাকুর ইহা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, “পঞ্চবটীতে ্যানকালে আমার এইরূপ অনুভূতি হইয়াছিল।” পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন থুরানাথ ভাবিতেন, প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন হে। এই প্রসঙ্গে তিনি ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, “ঈশ্বরকেও আইন ানে চল্‌তে হয়। তিনি একবার যা নিয়ম ক’রে দিয়েছেন তা রদ রবার ক্ষমতা তাঁরও নাই।” ঠাকুর ইহার উত্তর দিলেন, “ওকি থা তোমার! যাঁর আইন তিনি ইচ্ছা করলে তখনই তা রদ করতে ারেন, বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারেন।” থুরানাথ ইহা স্বীকার না করিয়া বলিলেন, “লাল ফুলের গাছে লাল লই হয়, সাদা ফুল কখনো হয় না। কারণ তিনিই এই নিয়ম করে িয়েছেন। কই লাল ফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি এখন করুন খি?” ঠাকুর উত্তর দিলেন, “তিনি ইচ্ছা করলে সব করতে পারেন, াও করতে পারেন।” কিন্তু ইংরাজী-শিক্ষিত যুক্তিবাদী মথুরানাথ হা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। পরদিন ঠাকুর ঝাউতলার দিকে াচে যাইয়া দেখিলেন, একটা লাল জবা ফুলগাছের একই ডালে টো ফেঁকড়িতে একটি লাল ফুল, আর একটি সাদা ফুল ফুটিয়াছে। াদা ফুলটি এত ধপ্‌ধপে সাদা যে, তাতে একছিটে লাল দাগও নেই। কুর ফুলের সহিত ডালটি শুদ্ধ ভাঙ্গিয়া আনিয়া মথুরের সম্মুখে লিয়া দিয়া বলিলেন, ‘এই দেখ।” তখন মথুরানাথ হার মানিয়া কুরকে বলিলেন, “হাঁ, বাবা, আমার হার হয়েছে।”

ঠাকুর এক এক দিন এমন এক কাণ্ড করিয়া বসিতেন যাহা খিয়া মথুরানাথ বিস্মিত না হইয়া পারিতেন না। একদিন ঠাকুর ন ঘণ্টাকাল সান্ধ্য আরতি করিয়া দেবালয়ের কর্মচারিদিগকে

ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। একদিন শিবমন্দিরে যাইয়া ঠাকুর পুষ্পদন্ত-রচিত সুপ্রসিদ্ধ শিবমহিম্ন স্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে একেবারে ভাববিভোর হইয়া পড়িলেন। তিনি স্তোত্র আবৃত্তি ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহাদেব গো! তোমার গুণের কথা আমি কেমন ক'রে বল্‌ব।" এইরূপ বলিতে বলিতে প্রেমাশ্রু তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া ঝরিতে লাগিল এবং বক্ষঃস্থল ও পরিহিত বস্ত্র আদ্র করিয়া ভূমিতে পড়িয়া মন্দির-তল সিক্ত করিল। মথুরানাথ সেদিন কালীবাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন। কর্মচারীদের গোলমাল শুনিয়া তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে ভাবাবিষ্ট দেখিয়া তিনি ভক্তিভরে তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেই সময় কোন কর্মচারী ঠাকুরকে শিবের নিকট হইতে বলপূর্বক সরাইয়া আনার কথা বলায় মথুরানাথ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যাহার মাথার উপর মাথা আছে সেই যেন এখন ছোট ভট্টাচার্য মহাশয়কে স্পর্শ করিতে যায়।" ইহা শুনিয়া কর্মচারীগণ ভীত হইয়া কিছু করিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের ভাবাবেশ প্রশমিত হইল এবং দেবালয়ের কর্মচারীদের সহিত মথুরানাথ তথায় দণ্ডায়মান দেখিয়া ঠাকুর বালকের ন্যায় ভীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি বেসামাল হয়ে কিছু করে ফেলেছি কি?" মথুরানাথ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "না বাবা, তুমি স্তব পাঠ কর্‌ছিলে। পাছে কেহ না বুঝিয়া তোমায় বিরক্ত করে, তাই আমি এখানে দাঁড়াইয়াছিলাম।" বিড়ালের মধ্যেও জগদম্বা বিরাজিতা দেখিয়া ঠাকুর একদিন কালীভোগের লুচি একটী বিড়ালকে খাওয়াইয়াছিলেন। ইহাতে খাজাঞ্চি মথুরানাথকে চিঠি লিখিলেন যে

ভট্চাযি্য মশায় ভোগের লুচি বিড়ালদের খাওয়াচ্ছেন। মথুরানাথ প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "উনি যা করেন তাতে কোনো কথা বলো না।" সাধুসেবা ও সাধুভক্তির এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বিরল দেখা যায়।

একদিন ঠাকুর ভগবদ্‌ভাবে আত্মহারা হইয়া তাঁহার ঘরের উত্তর-পূর্ব দিকস্থ লম্বা বারান্দায় আপন মনে পাদচারণ করিতেছিলেন। মথুরানাথ তখন কুটীরের একটি প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়াছিলেন। ঠাকুরের ভ্রমণস্থান হইতে মথুরানাথের প্রকোষ্ঠ অধিক দূরে ছিল না। তিনি ঠাকুরকে স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাহা আদৌ অবগত ছিলেন না। মথুরানাথ স্বকক্ষে বসিয়া দেখিলেন, 'ঠাকুর যখন পশ্চিমমুখী হইয়া গঙ্গার দিকে যাইতেছিলেন, তখন তিনি সাক্ষাৎ মহাদেব এবং যখন পূর্বমুখী হইয়া আসিতেছিলেন, তখন তিনি সাক্ষাৎ মা কালী।" মথুরানাথ প্রথমে ভাবিলেন, ইহা স্বীয় চক্ষুর ভ্রম-মাত্র। তিনি চক্ষুদ্বয় ভালরূপে মুছিয়াও আবার পূর্ববৎ দেখিলেন। তিনি যতবার দেখিলেন ততবারই সেই অদ্ভুত দর্শন পাইলেন। এইরূপ দেখিয়া তিনি শশব্যস্ত হইয়া দৌড়াইয়া ঠাকুরের নিকট আসিলেন এবং প্রণত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। ঠাকুর অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন। ঠাকুরকে একাধারে শিবশক্তিরূপে দেখিয়া এখন হইতে মথুরানাথ তাঁহাকে সিদ্ধ গুরুজ্ঞানে ভক্তি করিতেন। কখনো কখনো তিনি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ইষ্টজ্ঞানে পূজাদি করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "মথুরানাথের ঠিকুজীতে লেখা আছে, নিজ ইষ্টের তার প্রতি এতটা কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীর ধারণ করে সে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে ও তাকে রক্ষা করবে।" মথুরানাথ স্বীয় জন্ম-পত্রিকার কথায় এখন

সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইলেন। উক্ত অলৌকিক দর্শনের ফলে ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি-বিশ্বাস সহস্র গুণে বর্ধিত হইল। তিনি কলিকাতার কলুটোলাস্থ চৈতন্য সভার সভাপতি পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ এবং বর্ধমান জেলার ইঁদেশের গৌরী পণ্ডিত প্রভৃতিকে সাদরে আনাইয়া ঠাকুরকে দেখান এবং তাঁহাদের সম্মতিক্রমে ঠাকুরকে অবতারকল্প মহাপুরুষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।

মথুরানাথের ভক্তি-বিশ্বাস যতই বাড়িতে লাগিল ততই ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভ ও সেবার জন্য তিনি আগ্রহান্বিত হইলেন। অপরাহ্নে তিনি ঠাকুরকে স্বীয় গাড়ীতে লইয়া কলিকাতায় গড়ের মাঠ প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যাইতেন। মাঝে মাঝে তিনি ঠাকুরকে লইয়া যাইয়া কলিকাতার জানবাজারস্থ বাটীতে রাখিয়া সেবা করিতেন। ঠাকুরের পানাহারের সুবিধার্থ তিনি স্বর্ণ-রৌপ্যের এক সেট বাসন গড়াইয়া দেন। যখন ঠাকুরের গাত্রদাহ উপস্থিত হইল তখন মথুরানাথ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। একবার ঠাকুরের সাধ হইল, পশ্চিমী স্ত্রীলোকেরা যেরূপ পায়জোর প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করে, সেইরূপ অলঙ্কার ভবতারিণীকে পরাইবেন। ঠাকুরের শুভেচ্ছা জানিতে পারিয়া মকুরানাথ তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ অলঙ্কারাদি গড়াইয়া দিলেন বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখীভাব সাধনকালে ঠাকুর স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বেশ-ভূষা পরিধানের ইচ্ছা করিলেন। মথুরানাথ বাবার ইচ্ছা পূরণার্থ অবিলম্বে এক সেট ডায়মণ্ডকাটা অলঙ্কার, বারাণসী শাড়ী, ওড়না প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন। পানিহাটীর উৎসব দেখিবার ইচ্ছা ঠাকুরের হৃদয়ে বলবতী জানিয়া মথুরানাথ সযত্নে তাহার সুবন্দোবস্ত

করিয়া দিলেন এবং ভিড়ের মধ্যে বাবার কষ্ট হইবে ভাবিয়া স্বয়ং গুপ্তভাবে দারোয়ান সঙ্গে লইয়া বাবার দেহরক্ষীরূপে অদূরে রহিলেন।

একদা মথুরানাথ সহস্র মুদ্রা মূল্যে এক জোড়া বারাণসী শাল ক্রয় করেন। এমন উৎকৃষ্ট দ্রব্য আর কাহাকে দিবেন ভাবিয়া তিনি নিজ হস্তে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে উহা জড়াইয়া দিয়া মহানন্দ প্রাপ্ত হন। সেরূপ মূল্যবান্ জিনিষ এখন আর দেখিতেই পাওয়া যায় না। শালখানি পরিয়া প্রথমে ঠাকুর বালকের ন্যায় অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তিনি নিজে বার বার উহা দেখিলেন এবং অপরকে ডাকিয়া উহা দেখাইলেন এবং বলিলেন, "মথুর আমাকে ইহা এত দামে কিনয়া দিয়াছে।" কিন্তু পরক্ষণেই বালকের ন্যায় ঠাকুরের মনে অন্য ভাবের উদয় হইল। তিনি ভাবিলেন, "ইহাতে ছাগলের লোম ব্যতীত অন্য কিছু নাই। অন্যান্য বস্তুর মত ইহাও পঞ্চ ভূতে সৃষ্ট। ইহাতে কেবলমাত্র শীত-নিবারণ হয়, কিন্তু সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না।" এইরূপ ভাবিয়া তিনি শালটীকে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন এবং উহাতে থুথু দিতে ও উহাকে মাটীতে ঘসিতে লাগিলেন। পরিশেষে তিনি ইহাকে আগুনে পোড়াইবার উপক্রম করিলেন। এমন সময় কেহ সেখানে আসিয়া পড়িয়া উহাকে তাঁহার হাত হইতে উদ্ধার করিলেন। ঠাকুরের হাতে দামী বারাণসী শালের এরূপ দুর্দশা দেখিয়া মথুরানাথ দুঃখিত না হইয়া বলিলেন, "বাবা, বেশ করেছ।" একবার ঠাকুরের হৃদয়ে ভাল জরীর সাজ পরিবার এবং রূপার গুড়গুড়িতে তামাক খাইবার ইচ্ছা হয়। মথুরানাথ অবিলম্বে এই সকল দ্রব্য আনাইয়া দেন। সাজগুলি একবারমাত্র কিছুক্ষণ

পরিয়াই ঠাকুর ফেলিয়া দিলেন ও পদদলিত করিলেন। দুই একবার গুড়গুড়ি টানিয়াই তাঁহার গুড়গুড়িও ত্যাগ হইল।

কালীঘাটের ব্রাহ্মণ চন্দ্র হালদার মথুরানাথের অন্যতম কুল-পুরোহিত ছিলেন। ঠাকুরের প্রতি স্বীয় যজমানের গভীর ভক্তি দেখিয়া তিনি হিংসায় জর্জরিত হইলেন এবং ভাবিলেন, ঠাকুর কোনরূপ বশীকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা মথুরানাথকে বশীভূত করিয়াছেন। তিনি ঠাকুরকে অপমান করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। জানবাজার বাটীতে ঠাকুর একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অর্ধবাহ্য দশায় পড়িয়া আছেন. কাছে কেহ নাই। ঠাকুরের ভাব-সমাধি ভাঙ্গিতেছে এবং বাহ্য জগতের হুঁস অল্পে অল্পে আসিতেছে এমন সময় পূর্বোক্ত পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে একাকী ভাবস্থ দেখিয়া তিনি ভাবিলেন, ইহাই সুবর্ণ সুযোগ! তিনি ঠাকুরকে ঠেলিতে ঠেলিতে বার বার বলিতে লাগিলেন, "ওরে বামুন. বল্ না, বাবুকে কি করে বশ করলি? চুপ করে রইলি কেন?" তখন ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণের বাক্যব্যয়ের সামার্থ্য ছিল না। ঐরূপ বারম্বার বলা সত্ত্বেও ঠাকুর যখন কিছুই বলিলেন না, তখন পুরোহিত কুপিত হইয়া ঠাকুরকে সজোরে পদাঘাত করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। মথুরানাথ এই ঘটনা জানিতে পারিলে পুরোহিত শাস্তি পাইবেন ভাবিয়া ঠাকুর তাঁহাকে ইহা প্রথমে বলেন নাই। কিছুকাল পরে অন্য অপরাধে পুরোহিত বিতাড়িত হইলেন। সাধু-হিংসারূপ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত অনতিবিলম্বেই ঘটিল। তখন ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে মথুরানাথের নিকট এই ঘটনা বিবৃত করেন। ইহা শুনিয়া মথুরানাথ ক্রোধে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা, একথা আমি আগে জান্‌লে বাস্তবিকই ব্রাহ্মণের মাথা থাক্‌ত না।"

মথুরানাথের পত্নী জগদম্বা দাসীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। পতি-পত্নী উভয়ে বাবাকে লইয়া একত্রে আহার-বিহার এবং এক শয্যায় কতদিন পর্য্যন্ত শয়নও করিয়াছেন! তাঁহারা বাবাকে পাঁচ বৎসরের শিশুর মত দেখিতেন। সকল সময়ে সর্বাবস্থায় অন্দর-মহলে বাবার অবাধ গতি ছিল। সখীভাব সাধন কালে ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা পরিয়া দুর্গাপূজার সময় অন্তঃপুর-চারিণীদের সহিত মণ্ডপে আসিয়া প্রতিমাকে চামর-ব্যজন করিতেন কখনো বা কোন যুবতীর পতির আগমনে তাহাকে সাজাইয়া গুজাইয়া এবং বেশভূষা পরাইয়া শয়ন-কক্ষে পতির কাছে বসাইয়া দিতে যাইতেন। মথুরানাথকেও ঠাকুর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন এবং অকপটে সব কথা খুলিয়া বলিতেন ও তাঁহার মতামত লইতেন। একদিন মথুরানাথের সহিত কথা কহিতে কহিতে 'বাবা' বাহিরে গেলেন এবং চিন্তায় মুখখানি ভারী করিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং মথুরানাথকে বলিলেন, "একি ব্যারাম হল বল দেখি? দেখলুম, প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে শরীর থেকে একটা পোকা বেরিয়ে গেল। কারোর শরীরের ভিতরে এমন তো পোকা থাকে না। আমার এ কি হল?" মথুরানাথ বাবাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ওত ভালই হয়েছে বাবা! সকলের অঙ্গেই কামকীট থাকে। মার কৃপায় তোমার অঙ্গ থেকে সেই কামকীট বেরিয়ে গেল। এতে এত ভাবনা কেন?" ইহা শুনিয়াই 'বাবা' বালকের ন্যায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ। ভাগ্যিস্, তোমায় বল্লুম, জিজ্ঞাসা করলুম"। এই বলিয়া তিনি বালকবৎ আনন্দ করিতে লাগিলেন। জানবাজার বাড়ীতে যখন যাত্রাদি হইত তখন মথুরানাথ বাবা'কে মূল্যবান্ শাল ও বস্ত্র পরাইয়া বসাইতেন এবং

গায়ক-গায়িকা, অথবা অভিনেতা-অভিনেত্রীকে পুরস্কার দিবার জন্য দশ দশ টাকা থাক করিয়া একশত বা ততোধিক টাকা তাঁহার সম্মুখে রাখিতেন। 'বাবা' যাত্রা শুনিতে শুনিতে কাহারো গানে বা অভিনয়ে মুগ্ধ হইয়া হয়তো একেবারে সব টাকা হাতে ঠেলিয়া তাহাকে পুরস্কার দিতেন। টাকা নিঃশেষিত হইলে বাবা বহুমূল্য শাল, এমন কি পরিহিত বস্ত্র পর্য্যন্ত পুরস্কার দিয়া ভাবাম্বর মাত্র পরিধানে নিস্পন্দ ও সমাধিস্থ হইতেন। ইহাতে অর্থের সদ্ব্যবহার হইল ভাবিয়া মথুরানাথ আহ্লাদিত হইয়া 'বাবা'কে বীজন করিতে লাগিলেন। তিনি 'বাবা'কে যে বার তীর্থ ভ্রমণে লইয়া যান সেবার আশি হাজার মুদ্রা ব্যয় করেন। তখন 'বাবা'র কথায় তিনি কাশীতে 'কল্পতরু' হইয়া আবশ্যকীয় দ্রব্য যে যাহা চাহিলেন তাহাকে তাহাই দিলেন। তিনি সেইবার বাবাকে অনুরোধ করিলেন কিছু চাহিতে; কিন্তু 'বাবা' কিছুরই অভাব খুঁজিয়া পাইলেন না। বার বার অনুরুদ্ধ হওয়ায় 'বাবা' অবশেষে তাঁহার নিকট একটী কমণ্ডলু চাহিলেন। 'বাবা'র নিস্পৃহ নির্লোভ মনোভাব দেখিয়া মথুরানাথের চক্ষে জল আসিল। লীলাপ্রসঙ্গকার সারদানন্দ স্বামী সত্যই বলেন, "কি মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুরের ছিল মথুরের সহিত? ...দৈবনির্দিষ্ট না হইলে কি এত কাল এরূপ মধুর সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকিতে পারিত?" ঈশ্বরাবতারকে এত দীর্ঘকাল এমন ভক্তিভরে সেবা করিবার সৌভাগ্য কাহার হয়?

সাংসারিক বিপদে পড়িলেও মথুরানাথ ঠাকুরের শরণাপন্ন হইতেন' একদা অন্য জমিদারের সহিত তাঁহার ভীষণ বিরোধ উপস্থিত হইল। হঠকারী মথুরানাথের হুকুমে লাঠালাঠি ও খুনোখুনী হইয়া গেল। এই বিপদে পড়িয়া মথুরানাথ বাবাকে ধরিয়া বসিলেন, "বাবা, এই বিপদে

আমাকে রক্ষা কর।” বাবা ইহাতে চটিয়া যাইয়া তাঁহাকে তিরস্কার-পূর্বক বলিলেন, “তুই শালা রোজ একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে এসে বল্‌বি, ‘বাবা, রক্ষা কর।’ আমি কি করতে পারিরে শালা! যা, নিজে বুঝ্‌গে যা! আমি কি জানি?” বাবা প্রথমে চটিয়া গেলেও পরে মথুরানাথের নির্বন্ধাতিশয্যে নরম হইয়া বলিলেন, ”যা, মায়ের কৃপায় তোর বিপদ কেটে যাবে।” বাস্তবিকই বাবার করুণায় মথুরানাথ সেই দারুণ বিপদ হইতে সহজে রক্ষা পাইলেন। এই সম্বন্ধে ঠাকুর ১৮৮৩ খ্রীঃ ১৮ই ডিসেম্বর মঙ্গলবার ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, “সংসারী লোকদের একটা না একটা কামনা বাসনা থাকে। এদিকে ভক্তিও বেশ দেখা যায়। সেজ বাবু কি একটা মোকদ্দমায় পড়েছিল। আমায় মা কালীর কাছে বলেছিল, ‘বাবা এই অর্ঘ্যটী মাকে দাও তো।’ আমি উদার মনে দিলাম। কিন্তু তার কেমন বিশ্বাস যে, আমি দিলেই হবে।”

রাসমণি ও মথুরানাথের কল্যাণের দিকে ঠাকুরের কতদূর দৃষ্টি ছিল তাহার একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাসমণি ও মথুরানাথ স্বর্গগত হইবার অনেক পরে এই ঘটনা ঘটে। মথুরানাথের আমল হইতে কালী-বাড়ীতে এই বন্দোবস্ত ছিল যে, মা কালী ও রাধাকান্তের ভোগরাগাদির পর বড় এক থালা প্রসাদী অন্নব্যঞ্জন এবং আর একথালা ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের ঘরে প্রত্যহ আসিত। ঠাকুর স্বয়ং এবং তাঁহার ভক্তগণ ইহা হইতে প্রসাদ পাইতেন। তদ্‌ভিন্ন বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে কালীঘর এবং বিষ্ণুঘরের বিশেষ বিশেষ ভোগরাগাদির কিয়দংশও ঠাকুরের ঘরে প্রেরিত হইত। একবার ফলহারিণী কালীপূজার দিন বিশেষ পূজা ও ছোট-খাট উৎসব চলিতেছে এবং নহবত

বাজিতেছে। ঠাকুরের কাছে যোগানন্দ স্বামী প্রভৃতি কয়েকজন ভক্ত উপস্থিত। বিশেষ পর্বোপলক্ষে ঠাকুরের মধ্যে বিশেষ দেবভাব প্রকটিত হইত। সেদিনও তাহাই হইল। কালীপূজা সমাপ্ত হইতে প্রায় সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল এবং পরদিনও বেলা ৮।৯ টা বাজিল। কিন্তু ঠাকুরের ঘরে নির্দিষ্ট প্রসাদী ফলমিষ্টান্নাদি আসিল না. কালীঘরের পূজারী স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ঠাকুর ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু রামলাল উহার কারণ বলিতে পারিলেন না। রামলালের কথা শুনিয়া ঠাকুর ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন এবং বলিলেন, "কেন দপ্তরখানা হইতে এখনও এখানে প্রসাদ আসিল না?" বালকবৎ অস্থির হইয়া তিনি একে তাকে এই কথা জিজ্ঞাসা ও আলোচনা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ অপেক্ষা করার পরেও যখন প্রসাদ আসিল না, তখন চটিজুতা পরিয়া তিনি নিজেই খাজাঞ্চির নিকট যাইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ গো, ও-ঘরে (স্বীয় কক্ষ দেখাইয়া) বরাদ্দ পাওনা এখনও দেওয়া হয় নি কেন? ভুল হল না কি? চিরকেলে মামুলি বন্দোবস্ত এখন ভুল হয়ে বন্ধ হবে? বড় অন্যায় কথা!" খাজাঞ্চী কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া উত্তর দিলেন, "এখনও আপনার ওখানে প্রসাদী থালা যায় নি? বড় অন্যায় কথা! আমি এখনি পাঠাইয়া দিতেছি।" এই ব্যাপারে বালক যোগানন্দ ঠাকুরকে ভুল বুঝিলেন এবং সিদ্ধান্ত করিলেন, "বংশানুক্রমে চাল-কলা বাঁধা বামুনের ঘরে ঠাকুর জন্ম নিয়েছেন কি না! সে বংশের দোষগুণ একটু আধটু থাকবে ত?" ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন এবং অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে যোগানন্দের মনোভাব বুঝিয়া তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি জানিস্, দেবতার ভোগ হলে সাধু-সন্ত-ভক্ত প্রসাদ পাবে ব'লে

রাসমণি এতটা বিষয় দিয়ে গেছে। এখানে যা প্রসাদ জিনিষ আসে সে সব ভক্তেরাই খায়। ঈশ্বরকে জানব বলে যারা এখানে আসে তারাই সে সব পায়। রাসমণির যে জন্য দেওয়া তা এতে সার্থক হয়। কিন্তু ওরা (দেবালয়ের বামুনরা) যা সব নিয়ে যায় তার কি ওরূপ সদ্ব্যবহার হয়? তারা চাল বেচে পয়সা করে। কারও কারও আবার বেশ্যা আছে ; ঐ সব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ায়। রাসমণির যেজন্য দান তার কিছুও অন্ততঃ সার্থক হবে বলে এত ঝগড়া করি।" ঠাকুরের কাজের এত মহৎ উদ্দেশ্য আছে জানিয়া যোগানন্দজী নিজের ভুল বুঝিলেন এবং লজ্জিত হইলেন।

জগদম্বার ন্যায় রাসমণির অন্যান্য কন্যাগণও ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধা-সম্পন্ন ছিলেন। রাসমণির চার কন্যা ছিল, কোন পুত্র ছিল না। মথুরানাথ তৃতীয়া ও কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয়কে পর পর বিবাহ করিয়াছিলেন। জামাতাদিগের মধ্যে সম্পত্তিবিভাগ লইয়া পাছে কোন গণ্ডগোল বাধে এইজন্য বুদ্ধিমতী রাসমণি স্বয়ং জীবিত থাকিতে প্রত্যেক কন্যার ভাগ নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করিয়া দিয়া যান। এইরূপে বিষয়-বিভাগ হইবার পরে একদিন মথুরানাথের পত্নী জগদম্বা অন্য ভগ্নীর অংশের এক পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যান এবং তথায় সুন্দর সুষ্‌নী শাক দেখিয়া তুলিয়া লইয়া আসেন। একমাত্র ঠাকুর তাঁহার উক্ত কার্য দেখিতে পান। ইহা দেখিয়াই ঠাকুরের সরল মন অন্দোলিত হইল। বালকবৎ তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "না বলিয়া ঐরূপে অপরের জিনিষ জগদম্বা লইয়া গেল। এত বড় অন্যায়! ওরূপে লইলে যে চুরি করা হয়! আর অপরের জিনিষে ওরূপ লোভ করাও অনুচিত।" ঠাকুর এইরূপে নানা কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় রাণীর যে কন্যার

ভাগে উক্ত পুষ্করিণী পড়িয়াছিল, তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি ঠাকুর তাঁহাকে সব কথা বলিয়া ফেলিলেন। তিনি এই সব শুনিয়া এবং স্বীয় ভগ্নীর তথা-কথিত অন্যায় আচরণে ঠাকুরকে চিন্তিত দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি ব্যঙ্গ করিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "তাইত বাবা, জগদম্বা বড় অন্যায় করেছে!" এমন সময় জগদম্বাও হঠাৎ তথায় আসিলেন। তিনিও ভগ্নীর হাস্যের কারণ শুনিয়া পরিহাসপূর্বক বলিলেন, "বাবা, একথাটিও কি ওকে বলে দিতে হয়? পাছে ও দেখতে পায় তাই আমি লুকিয়ে শাকগুলো চুরি করে নিয়ে এলুম! আর তুমি তা তাকে বলে দিয়ে আমাকে অপদস্ত করলে!" এই বলিয়া দুই ভগ্নীতে হাস্যের রোল তুলিলেন। তখন ঠাকুর তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তা কি জানি মা, যখন সব বিষয় ভাগ হয়ে গেল তখন ওরূপে না বলে নেওয়াটা ভাল কি? তাই বলে দিলুম। ইনি শুনে যা হয় বোঝাপড়া করুন!" রাণীর কন্যাদ্বয় বাবার কথা শুনিয়া আরও হাসিলেন এবং ভাবিলেন, বাবার কি সরল শিশুভাব।

মথুরানাথের দ্বিতীয়া পত্নী জগদম্বা দাসী একবার দুরারোগ্য গ্রহণী-রোগে আক্রান্তা হন। ক্রমশঃ ব্যাধি এত বাড়িয়া গেল যে, কলিকাতার প্রসিদ্ধ ডাক্তার-কবিরাজগণ আরোগ্যের আশা ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে মথুরানাথ মর্মাহত হইলেন। কারণ জগদম্বার মৃত্যু হইলে তিনি যে শুধু প্রিয়া পত্নীকে হারাইবেন তাহা নহে, রাসমণির বিষয়-সম্পত্তির উপর তাঁহার আধিপত্যও চলিয়া যাইবে। তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে গেলেন এবং কালীমন্দিরে দেবীকে প্রণামান্তে তাঁহার নিকট পঞ্চবটীতে উপস্থিত

হইলেন। মথুরানাথকে উন্মত্তপ্রায় দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সযত্নে কাছে বসাইলেন এবং এইরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন মথুরানাথ কাঁদিতে কাঁদিতে ঠাকুরের পদদ্বয় ধরিয়া স্বপত্নী জগদম্বার কঠিন অসুখের কথা জানাইয়া শেষে বলিলেন, "আমার যাহা হইবার তাহা ত হইতে চলিল। বাবা, তোমার সেবাধিকার হইতেও এবার বঞ্চিত হইলাম। তোমার সেবা আর করিতে পাইব না!" সেবক-ভক্তের দীনভাব দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ হইল। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরানাথকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই। জগদম্বা সারিয়া যাইবে।" বিশ্বাসী মথুরানাথ ঠাকুরের অমোঘ আশীষ লাভে আশ্বস্ত হইলেন এবং স্বগৃহে ফিরিয়া দেখিলেন, বাবার কৃপায় জগদম্বা দাসীর অবস্থা একটু ভাল হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেন, "সেই দিন হইতে জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল এবং তাহার উক্ত রোগটার ভোগ (নিজ শরীরে দেখাইয়া) এই শরীরের উপর দিয়া হইতে লাগিল। জগদম্বা দাসীকে ভাল করিয়া আমাকে ছয় মাস কাল পেটের পীড়া ও অন্যান্য রোগে ভুগিতে হইয়াছিল।" মথুরানাথের সেবা ও ভক্তির কথা বলিবার সময় উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া ঠাকুর একদিন তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন, "মথুর যে চৌদ্দ বৎসর সেবা করিয়াছিল তাহা কি অমনি করিয়াছিল? মা তাহাকে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর অদ্ভুত অদ্ভুত সব দেখাইয়াছিলেন। সেইজন্যই সে অত সেবা করিয়াছিল।"

গৌরী পণ্ডিতের দেখাদেখি ঠাকুর প্রথমতঃ 'আমি' না বলিয়া 'ইনি' বলিতেন। ইহা শুনিয়া মথুরানাথ ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন,

"সে কি বাবা! তুমি ওসব কেন বলবে? ওসব ওরা বলুক, ওদের অহঙ্কার আছে। তোমার ত আর অহঙ্কার নাই। তোমার ওসব বলার কোন দরকার নাই।" মথুরানাথের পরামর্শে ঠাকুর নিজেকে 'ইনি' বলা ছাড়িয়া দিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জননী চন্দ্রামণি কালীবাড়ীতে স্বীয় পুত্রের নিকট শেষ জীবনের প্রায় বার বৎসর বাস করিয়া তথায় স্বর্গগতা হন। মথুরানাথ তাঁহাকেও গভীর শ্রদ্ধা করিতেন এবং ঠাকুরমা বলিয়া ডাকিতেন। তিনি যখন কালীবাড়ীতে আসিতেন, তখন ঠাকুরমার কাছে বসিয়া গল্প করিতেন। এইরূপে তিনি ক্রমে চন্দ্রাদেবীর অশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন, "ঠাকুরমা, তুমি ত আমার নিকট হইতে কখনও কিছু সেবা গ্রহণ করিলে না? তুমি যদি যথার্থই আমাকে আপনার বলিয়া ভাব, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তোমার জন্য যাহা কিছু চাহিয়া লও।" সরলা বৃদ্ধা মথুরের প্রস্তাবে মুশ্‌কিলে পড়িলেন। কারণ তাঁহার অভাব-বোধ আদৌ ছিল না। সেইজন্য কি চাহিবেন তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। নিরূপায় হইয়া শেষে তিনি বলিলেন, "বাবা, তোমার কল্যাণে আমার এখন তো কোন কিছুর অভাব নাই। যখন কোন জিনিষের অভাব হইবে, তখন চাহিয়া লইব।" এই বলিয়া তিনি মথুরকে নিজ পেট্‌রা খুলিয়া রক্ষিত পরিধেয়গুলি দেখাইলেন। তৎপরে তিনি আবার মথুরকে বলিলেন, "বাবা, তোমার দৌলতে খাওয়ার ত কোন কষ্টই নাই, সকল বন্দোবস্তই তুমি করিয়া দিয়াছ ও দিতেছ। তবে আর কি চাহি বল?" ইহাতেও নিরস্ত না হইয়া মথুরানাথ কোন কিছু চাহিবার জন্য চন্দ্রাদেবীকে বার বার অনুরোধ করিলেন। অনেক

াবিয়া চিন্তিয়া বৃদ্ধা একটি অভাবের কথা স্মরণ করিলেন এবং াসিতে হাসিতে বলিলেন, "যদি নেহাৎ দিবে, তবে আমার এখন খে দিবার গুল নাই, এক আনার দোক্তা তামাক কিনিয়া দাও।" র্লোভ চন্দ্রামণির কথা শুনিয়া বিষয়ী মথুরের চক্ষে জল আসিল। তনি বৃদ্ধাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এমন মা না হইলে কি এমন ্যাগী পুত্র হয়।" এই বলিয়া তিনি বৃদ্ধার জন্য দোক্তা তামাক ানাইয়া দিলেন।

"রাণী রাসমণির জীবন-বৃত্তান্ত" নামক পুস্তকে আছে, মথুরানাথ ২৭০ সালে নাটমন্দিরে বহুব্যয়সাধ্য অন্নমেরু ব্রতানুষ্ঠান করেন। ক্ত ব্রতকালে প্রভূত স্বর্ণরৌপ্যাদি ব্যতীত হাজার মণ চাউল এবং াজার মণ তিল তিনি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে দান করেন! এই উপলক্ষে হচরী নাম্নী প্রসিদ্ধা গায়িকার কীর্তন, রাজনারায়ণের চণ্ডীগান ও াত্রাদিতে কালীবাড়ী কিছু কাল উৎসব-ক্ষেত্রে পরিণত হয়। পরোক্ত গায়ক-গায়িকাগণের ভক্তিমূলক সঙ্গিতাদি শ্রবণে ঠাকুর ুমুর্হুঃ সমাধিস্থ হইতেন। ইহাতে অনুষ্ঠান সার্থক হইল ভাবিয়া থুরানাথ তাহাদিগকে বহুমূল্য শাল, রেশমী বস্ত্র ও প্রচুর অর্থ দান রেন। ঠাকুরের কৃপালাভে ধন্য হইয়াই তিনি উক্ত পুণ্যকর্মে অগ্রসর ন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, তাঁহার ইষ্টদেবীই রামকৃষ্ণ-দেহে াবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে এইরূপে কৃতার্থ করিতেছেন।

ঠাকুর মথুরানাথকে অতিশয় বিশ্বাস করিতেন। সাধনকালে বা দ্ধাবস্থায় কোন দ্রব্যের প্রয়োজন হইলে, ঠাকুর মথুরানাথকে সর্বাগ্রে ানাইতেন। সমাধিকালে বা অন্য সময়ে তাঁহার যে দর্শনাদি হইত, াহা মথুরানাথকে বলিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "এটা কেন হল

বল দেখি? ওটার সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয়?" একদিন বাবা কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার একনিষ্ঠ সেবক ও ভক্ত মথুরানাথকে বলিলেন, "দেখ, মা আমায় সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, এখানকার সব ঢের অন্তরঙ্গ ভক্ত আছে। তারা সব আসবে, এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে ও শুনবে, প্রত্যক্ষ করবে ও প্রেম-ভক্তি লাভ করবে। (নিজের শরীর দেখাইয়া) মা এই খোলটা দিয়ে অনেক খেলা খেলবে, অনেকের কল্যাণ করবে। তাই এ খোলটা রেখেছে, এখনও ভেঙ্গে দেয় নি। তুমি কি বল? এ সব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখেছি বল দেখি।" মথুরানাথ ইহা শুনিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "মাথার ভুল কেন হবে বাবা, মা যখন তোমায় এ পর্য্যন্ত কোনটাই ভুল দেখান নি তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে। এখনও তারা সব দেরী করছে কেন? তারা শীঘ্র আসুক না, তাদের নিয়ে আনন্দ করি।" বাবাও মথুরানাথের কথায় আশ্বস্ত হইলেন এবং বলিলেন, "কি জানি, কবে তারা আসবে। তবে মা আমাকে দেখিয়েছেন। মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।"

আর একদিন মথুরানাথ উক্ত প্রসঙ্গ তুলিয়া ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি যে বলেছিলে তোমার ভক্তেরা আসবে, তারা কেউ তো এখনো এল না?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "কি জানি, মা তাহাদিগকে কত দিনে আনবেন। এ কথা কিন্তু মা স্বয়ং আমাকে জানিয়েছেন যে তারা নিশ্চয়ই আসবে। অপর যাহা যাহা দেখাইয়াছেন, সে সব তো একে একে সত্য হয়েছে। এটি কেন সত্য হচ্ছে না কে জানে?" ইহা বলিয়া ঠাকুর বিষণ্ণ চিত্তে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার উক্ত দর্শন কি তবে মিথ্যা হইল? বাবাকে বিষণ্ণ দেখিয়া মথুরানাথ ব্যথিত

হইলেন এবং বুঝিলেন, এই কথা পাড়িয়া তিনি ভাল করেন নাই। সেইজন্য শিশুস্বভাব বাবাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, "তারা আসুক্ আর নাই আসুক্ বাবা, আমি তো তোমার চিরানুগত ভক্ত রয়েছি। তবে তোমার দর্শন সত্য হল না কিরূপে ? আমি একাই তো এক শত ভক্তের তুল্য। তাই মা তোমায় বলেছিলেন, অনেক ভক্ত আসবে!" ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "তুমি যা বলছ তাই বা হবে।" মথুরানাথ এই প্রসঙ্গে আর অধিক দূর অগ্রসর হইলেন না এবং অন্য কথা পাড়িয়া বাবাকে ভুলাইয়া দিলেন।

জানবাজার বাটীতে দুর্গোৎসবের সময় মথুরানাথ বাবাকে লইয়া যাইতেন। বাবার উপস্থিতিতে উৎসবানন্দ শত গুণে বর্ধিত হইত। পূজামণ্ডপে বসিয়া বাবা প্রতিমাতে জগন্মাতার সাক্ষাৎ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন।

সেইজন্য ভক্তিমান্ দর্শক দেখিতেন, প্রতিমা যেন জীবন্ত, জ্যোতির্ময় এবং হাস্যময়। বাবা যখন পূজামণ্ডপে বসিতেন, তখন তথাকার বায়ুমণ্ডল অনির্বচনীয় অনির্দেশ্য দিব্যভাবে পরিপূর্ণ হইত। মণ্ডপ জম্ জম্ করিত, প্রতিমা উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। সমগ্র বাটীতে অপূর্ব আনন্দ-স্রোত বহিত। পূজাকালে অলৌকিক দেবভাবে 'বাবা' মাতোয়ারা থাকিতেন। মহাসপ্তমীতে দিবসের পূজা শেষ হইল। মথুরানাথ ও জগদম্বা জগন্মাতা ও 'বাবা'র চরণে ভক্তিভরে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। সন্ধ্যা সমাগতা। এবার দুর্গাদেবীর আরাত্রিক হইবে। 'বাবা' জগন্মাতার সখী ভাবে অভিভূত এবং পুরুষ-দেহের কথা বিস্মৃত। নারীর মত তিনি মথুরানাথ-প্রদত্ত গরদের চেলি পরিয়াছেন। 'বাবা'র গাত্রবর্ণ তখন অতি সুন্দর ছিল, রূপ যেন ফাটিয়া পড়িত। ভাবাবেশে

বর্ণ আরো উজ্জ্বল হইত, শরীর দিয়া যেন একটা জ্যোতিঃ বাহির হইত। তিনি তখন শ্রীঅঙ্গে যে সুবর্ণময় ইষ্ট-কবচ ধারণ করিতেন উহার স্বর্ণবর্ণ ও গাত্রবর্ণ মিলিয়া এক হইয়া যাইত। পরবর্তী সময়ে ঠাকুর এই সম্বন্ধে বলিতেন, "তখন এমন রূপ হয়েছিল রে, যে লোকে চেয়ে থাকত। বুক মুখ সব সময় লাল হয়ে থাকত, আর গা দিয়ে যেন একটা জ্যোতিঃ বেরুত। লোকে চেয়ে থাক্‌ত বলে একখানা মোটা চাদর সর্বক্ষণ মুড়ি দিয়ে থাকতুম। আর যাকে বলতুম, "মা তোর বাহিরের রূপ তুই নে, আমায় ভিতরের রূপ দে।' গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চাপড়ে চাপড়ে বল্‌তুম, ভিতরে ঢুকে যা ভিতরে ঢুকে যা। তবে কতদিন পরে ওপরটা ওরূপ মলিন হয়ে গেল।"

সন্ধ্যায় দুর্গাদেবীর আরাত্রিক আরম্ভ হইবে। মথুরানাথের পত্নী জগদম্বা আরাত্রিক দেখিতে মণ্ডপে যাইবার জন্য অস্থির হইলেন কিন্তু ভাবাবিষ্ট 'বাবা'কে একাকী ফেলিয়া যাইতে তাঁহার প্রাণ চাহিল না। কারণ, 'বাবা' একবার ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় (কল্‌কের) গুলের আগুনের উপর পড়িয়াও হুঁস হয় নাই এবং তাঁহার গায়ের চাম্‌ড়া পুড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার সেই ক্ষত স্থান কত দিনে কত চিকিৎসায় সারিয়া ছিল। ভক্তিমতী জগদম্বা এক অভিনব উপায় উদ্‌ভাবন করিলেন। তিনি অবিলম্বে স্বীয় মূল্যবান অলঙ্কারসমূহ ও শাড়ী বাহির করিয়া 'বাবা'কে পরাইতে পরাইতে তাঁহার কানের গোড়ায় বার বার বলিতে লাগিলেন, "বাবা চল, মার যে আরতি হইবে। মাকে চামর করিবে না?" ভাগ্যবতী জগদম্বার কথা ঠাকুরের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া অর্ধবাহ্য দশা

প্রাপ্ত হইলেন এবং আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা পূজামণ্ডপে যাইবামাত্র আরাত্রিক আরম্ভ হইল। 'বাবা' জগদম্বাপ্রমুখ নারীগণ পরিবৃত হইয়া দুর্গা-প্রতিমাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। মণ্ডপের একদিকে জগদম্বাপ্রমুখ নারীগণ এবং অন্য দিকে মথুরানাথ প্রভৃতি পুরুষগণ দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছিলেন। সহসা মথুরানাথের দৃষ্টি মহিলাবর্গের দিকে পড়িল। তিনি দেখিলেন, তাঁহার পত্নীর পার্শ্বে দণ্ডায়মানা বিচিত্র বস্ত্রালঙ্কারে ও অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্য্যে বিভূষিতা এক নারী দুর্গাদেবীকে চামর ব্যজন করিতেছেন। বারম্বার দেখিয়াও তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন ভাবিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার পত্নীর পরিচিতা কোন সঙ্গতিপন্না মহিলা নিমন্ত্রিতা হইয়া আসিয়াছেন। আরতি সাঙ্গ হইলে সকলে দেবীকে প্রণামপূর্ব্বক স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। 'বাবা'ও মথুরানাথের পত্নীর সহিত অন্তঃপুরে যাইয়া অলঙ্কারাদি খুলিয়া সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থায় বাহিরে আসিয়া পুরুষদের সহিত বসিলেন। কিছুক্ষণ পরে মথুরানাথ কার্য্যান্তরে অন্দরে যাইয়া কথায় কথায় স্বপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরতির সময় কে তোমার পাশে দাঁড়াইয়া প্রতিমাকে চামর করিতেছিলেন?" ইহাতে জগদম্বা স্বপতিকে উত্তর দিলেন, "তুমি চিনিতে পার নাই? বাবা ভাবাবস্থায় ঐরূপে চামর করিতেছিলেন। তাহা হইতেই পারে। মেয়েদের মত কাপড়-চোপড় পরিলে বাবাকে পুরুষ বলিয়া মনেই হয় না।" ইহা বলিয়া মথুরানাথকে তিনি আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। সব কথা শুনিয়া মথুরানাথ অবাক্ হইয়া বলিলেন, 'তাইত সামান্য বিষয়েও ধরা না দিলে বাবাকে চেনে কার সাধ্য! দেখ না, চব্বিশ ঘণ্টা দেখে এবং একত্র থেকেও আজ বাবাকে

চিন্‌তে পারলাম না।" এই উক্তি হইতে বোঝা যায়, ঠাকুরকে মথুরানাথ কি চক্ষে দেখিতেন।

সেই বার সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী মহানন্দে কাটিল। বিজয়া দশমীর দিন জানবাজারে মাড়দের বাটীতে বিষাদের ছায়া পড়িল। মথুরানাথ এবং তাঁহার পত্নী জগদম্বা নয়নাশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। পুরোহিত দেবীর পূজাদি সারিয়া বিসর্জন দানের জন্য প্রস্তুত। তিনি মথুরানাথকে সংবাদ দিলেন নীচে আসিয়া দেবীকে প্রণাম ও বন্দনাদি করিতে। কিন্তু ভক্তিমান মথুরানাথ দেবীকে বিসর্জন দানের কথা ভাবিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, "যেনন পূজা হইতেছে তেমনি হইবে। আমি মাকে বিসর্জন দিতে দিব না।" এই বলিয়া তিনি গম্ভীর ভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ শুনিয়া পুরোহিত এবং বাড়ীর সকলে চিন্তিত হইলেন। অনেকে তাঁহাকে বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কাহারো কথায় কর্ণপাত করিলেন না। মথুর-পত্নী জড়দম্বার অনুরোধে 'বাবা' মথুরানাথকে বুঝাইতে গেলেন। 'বাবা' যাইয়া দেখেন, মথুরানাথের মুখমণ্ডল গম্ভীর ও চক্ষুদ্বয় লাল এবং তিনি উন্মনা ভাবে স্বীয় কক্ষ-মধ্যে পাদচারণ করিতেছেন। বাবাকে দেখিয়াই মথুরানাথ তাঁহার কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, যে যাহাই বলুক্, প্রাণ থাকিতে আমি মাকে বিসর্জন দিতে পারিব না। আমি মায়ের নিত্যপূজা করিব। মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব বাবা?" বাবা মথুরানাথের বক্ষে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ওঃ এই তোমার ভয়! তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বল্লে? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখন থাকতে পারেন? এই তিন দিন বাহিরে দালানে বসে

মা তোমার পূজা নিয়েছেন। আজ হতে সর্বদা তোমার হৃদয়ে বসে তিনি পূজা নেবেন।" 'বাবা'র দিব্য স্পর্শে মথুরানাথের অলৌকিক অনুভূতি হইল। মথুরানাথ সত্যসত্যই মানস নেত্রে দেখিলেন, দুর্গাদেবী চিন্ময় মূর্তিতে তাঁহার হৃদয়-কন্দর অপূর্ব আলোকে উজ্জ্বল করিয়া বিদ্যমানা। এই অদ্ভুত দর্শনে তাঁহার প্রেমানন্দ শত গুণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং দেবীর বিসর্জন করিতে অনুমতি দিলেন।

ঠাকুরের পূত সঙ্গে থাকিয়া এবং ভাব-সমাধিতে তাঁহার অসীম আনন্দানুভব দেখিয়া মথুরানাথের অন্তরে উক্ত সমুচ্চ অবস্থা লাভের ইচ্ছা জাগিল। এই ভাবোদয় হইবামাত্র তিনি বাবাকে যাইয়া ধরিলেন, "বাবা, আমার যাহাতে ভাব-সমাধি হয় তাহা তোমায় করিয়া দিতেই হইবে।" 'বাবা' তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "ওরে কালে হবে, কালে হবে। তুই ত বেশ আছিস্, এদিক ওদিক দুদিক চলছে। ওসব হলে এদিক্ (সংসার) থেকে মন উঠে যাবে। তখন তোর বিষয়-সম্পত্তি সব রক্ষা করবে কে? বার ভূতে সব লুটে খাবে। তখন কি করবি?" কিন্তু মথুরানাথ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। ঠাকুর উদ্ধব ও গোপীদের দৃষ্টান্ত দিয়া আবার অনেক বুঝাইলেন, তবুও মথুরানাথ স্বীয় সংকল্প ত্যাগ করিলেন না। ইহাতেও যখন মথুরানাথ নিরস্ত হইলেন না তখন ঠাকুর বলিলেন, "মাকে বলব। তিনি যা হয় করবেন।" ইহার অল্প কাল পরেই একদিন মথুরানাথের ভাব-সমাধি হইল। তিনি 'বাবা'কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বাবা জানবাজার বাটীতে যাইয়া দেখিলেন, "মথুর যেন মানুষ নয়, তার চক্ষু লাল, জল পড়ছে। ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে কেঁদে

ভাসিয়ে দিচ্ছে! আর বুক থর থর করে কাঁপছে।” ঠাকুরকে দেখিয়া মথুরানাথ তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, “বাবা, ঘাট হয়েছে। আজ তিন দিন ধরে এই রকম অবস্থা। চেষ্টা করলেও বিষয়-কর্মের দিকে কিছুতেই মন যায় না। সব খানে খারাপ হয়ে গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমি চাই নে।” ‘বাবা’ বলিলেন, “কেন ? তুই তো ভাব-সমাধির জন্য এত আকুল হয়েছিলি।” মথুরানাথ উত্তর দিলেন, “হাঁ, এতে আনন্দও আছে। কিন্তু হলে কি হয় ? এদিকে যে সব যায়। বাবা, ও ভাব তোমাকেই সাজে। আমাদের ও সবে কাজ নেই, ফিরিয়ে নাও!’ তখন ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, “তোকে ত এ কথা আগেই বলেছিলুম।” মথুরানাথ ভক্তিভরে নিবেদন করিলেন, “হাঁ বাবা, তখন কি অতশত জানি যে, ভূতের মত এসে এভাব ঘাড়ে চাপ্‌বে। আর তার গোঁতে আমায় চব্বিশ ঘণ্টা থাকতে হবে! ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারবো না।” তখন ‘বাবা’ মথুরানাথের বুকে হাত বুলাইয়া তাঁহার ভাবাবেশ প্রশমিত করিলেন। এই ভাবে ঠাকুর গুরুভাবে মথুরানাথকে বহু বার কৃপা করিয়াছিলেন।

মথুরানাথ ঠাকুরকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি-বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহাকে ইহকাল ও পরকালের সর্বস্ব ও সম্বল বলিয়া জানিতেন। শেষ জীবনে মথুরানাথের শরীরের এক সন্ধিস্থলে একটি বৃহৎ স্ফোটক হইয়াছিল। ইহাতে মথুরানাথ শয্যাশায়ী হন এবং অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেন। তখন একবার বাবাকে দেখিবার জন্য তিনি অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাবা হৃদয়রামের নিকট ইহা জানিতে পারিয়া বলিলেন, “আমি যাইয়া কি করিব ? তাহার ফোড়া আরোগ্য

করিবার শক্তি কি আমার আছে?" ঠাকুর না যাওয়াতে মথুরানাথ পুনঃ পুনঃ লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। তাঁহার ব্যাকুল আহ্বানে ঠাকুরকে অগত্যা জানবাজারে যাইতে হইল। ঠাকুরকে দেখিয়া মথুরানাথের আনন্দের অবধি রহিল না। তিনি অতিকষ্টে উঠিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া স্বীয় শয্যায় বসিলেন এবং ঠাকুরকে বলিলেন, "বাবা, একটু পায়ের ধূলা দাও।" ইহা শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আমার পায়ের ধূলা লইয়া কি হইবে? তোমার ফোড়া কি আরোগ্য হইবে?" ইহাতে মথুরানাথ কাতর ভাবে নিবেদন করিলেন, "বাবা, আমি কি এমনই যে, তোমার পায়ের ধূলা ফোড়া আরোগ্য করিবার জন্য চাহিতেছি? তাহার জন্য তো ডাক্তার আছে। ভবসাগর পার হইবার জন্য আমি তোমার শ্রীচরণের পবিত্র ধূলা চাহিতেছি।" মথুরানাথের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। এই সুযোগে মথুরানাথ বাবার চরণে মস্তক স্থাপনপূর্বক নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন! ভাবাবিষ্ট দেবমানবের পাদস্পর্শ করিয়া তাঁহার দুই নয়নে আনন্দাশ্রু ঝরিতে লাগিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মথুরানাথের সম্বন্ধ যে কতদূর সুগভীর ও সুমধুর ছিল তাহা নিম্নোক্ত ঘটনায় স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরানাথকে বলিলেন, "মথুর, তুমি যতদিন (জীবিত) থাকিবে আমি ততদিন এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) থাকিব।" ইহা শুনিয়া মথুরানাথ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, সাক্ষাৎ ভবতারিণীই ঠাকুরের দেহাবলম্বনে তাঁহাকে এবং তাঁহার পরিজনবর্গকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন। সুতরাং ঠাকুর কালীবাড়ী ত্যাগ করিলে তাঁহাদিগের অকল্যাণ হইবে।

অনন্তর তিনি কাতর ভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, সে কি বাবা, আমার পত্নী এবং পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে।" মথুরানাথকে কাতর দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তোমার পত্নী ও দোয়ারি যতদিন থাকিবে আমি ততদিন এখানে থাকিব।" সত্যবাক্ শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ বাণী বর্ণে বর্ণে সত্য হইল। শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ১৮৮১ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে আঠান্ন বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। জগদম্বা ও তৎপুত্র দ্বারকানাথের দেহত্যাগের অল্প কাল পরেই ঠাকুর চিরতরে কালীবাড়ী ত্যাগ করেন। একদিন মথুরনাথ ঠাকুরের সেবার জন্য একখানি তালুক লিখিয়া দিবার উদ্দেশ্যে হৃদয়রামের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ঠাকুর কালী-ঘর হইতে এই কথা শুনিয়া মথুরানাথকে বলিয়াছিলেন, "ত্থাখো অমন বুদ্ধি করো না। এতে আমার ভারী হানি হবে।"

১২৭৮ সালে আষাঢ় মাসে মথুরানাথ জ্বররোগে শয্যাগত হইলেন। সেই বৎসর ঠাকুরের সহিত তাঁহার মিলন পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। তাঁহার জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া সাত আট দিনের মধ্যেই তাঁহাকে বিকারগ্রস্থ করিল। জ্বররোগের বিকারে মথুরানাথের বাক্‌রোধ হইল। ঠাকুর পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন, মথুরানাথের সেবা ও ভক্তির মহাব্রত সমাপ্ত। তিনি হৃদয়রামকে প্রত্যহ জানবাজারে পাঠাইতেন মথুরানাথকে দেখিবার জন্য; কিন্তু স্বয়ং একদিনও গেলেন না। অন্তিমকাল সমাগত দেখিয়া মথুরানাথকে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া হয়। শেষ দিনে ঠাকুর হৃয়রামকেও মথুরানাথের নিকট পাঠাইলেন না; কিন্তু অপরাহ্ণে দুই তিন ঘণ্টা কাল সমাধিস্থ থাকিয়া জ্যোতির্ময়মার্গে দিব্য দেহে অন্তরঙ্গ ভক্ত-সেবকের পার্শ্বে উপনীত হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ

করিলেন এবং পুণ্যলোকে তাঁহাকে পাঠাইলেন। যখন ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইল তখন পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। তিনি হৃদয়রামকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বার সখিগণ মথুরানাথকে সাদরে দিব্য রথে উঠাইয়া লইলেন এবং তাঁহার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গমন করিল।" সেইদিন গভীর রাত্রে কালীবাড়ীর কর্মচারিগণ ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন, মথুরানাথ অপরাহ্ন পাঁচটায় দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে ঠাকুরের মুখে কোন ভক্ত মথুরানাথের অপূর্ব ভক্তি ও সেবার কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার সৌভাগ্যের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত্যুর পর মথুরের কি হল মশায়? তাঁকে নিশ্চয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না।" ইহা শুনিয়া ঠাকুর উত্তর দিলেন, "কোথাও একটা রাজা হয়ে জন্মেছে আর কি। তার ভোগবাসনা ছিল।" এই বলিয়া ঠাকুর প্রসঙ্গান্তর উত্থাপন করিলেন।

মথুরানাথ ঠাকুরকে গুরুবৎ সেবা-ভক্তি করিতেন। তাঁহাকে ঠাকুরের প্রথম শিষ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ মথুরানাথ ঠাকুরকে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতেন এবং সন্তানভাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার দেহত্যাগ হয় ১২৭৮ সালে ১লা শ্রাবণ (১৮৭১ খ্রীঃ ১৬ই জুলাই) রবিবার বৈকালে। ঠাকুরের তান্ত্রিক গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলিতেন, শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত-সেবক পুরীরাজ প্রতাপরুদ্রই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের রসদ্দার মথুরানাথরূপে অবতীর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধি

কালীসাধন

১২৫৯ সালে (১৮৫১ খ্রীঃ) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতার ঝামাপুকুর পল্লীস্থ চতুষ্পাঠিতে জ্যেষ্ঠাগ্রজ রামকুমারের নিকট আসেন। 'চাল-কলা বাঁধা' বিদ্যায় তাঁহার আদৌ মন না থাকায় রামকুমার তাঁহাকে কয়েকটী গৃহস্থের বাটীতে স্বকরণীয় নিত্যপূজার ভারার্পণ করেন। তখন গদাধরের বয়স ১৪।১৫ বৎসর মাত্র। ঝামাপুকুরে এই রূপে তিন বৎসর কাটিল। ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠার দিন অগ্রজের সহিত গদাধর সর্বপ্রথম দক্ষিণেশ্বরে আগমন করেন। কিন্তু তিনি 'কৈবর্তের অন্ন' খাইলেন না, সারা দিন উপবাসী থাকিয়া সন্ধ্যাসমাগমে দোকান হইতে মুড়িমুড়কি কিনিয়া খাইয়া ঝামাপুকুরে ফিরিলেন। পরদিন প্রত্যুষে অগ্রজের সংবাদ গ্রহণ এবং মন্দির-প্রতিষ্ঠার অবশিষ্ট উৎসব দর্শন মানসে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন এবং দেবীর প্রসাদ গ্রহণার্থ অগ্রজের অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া মধ্যাহ্নে ঝামাপুকুরে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় তিনি অগ্রজের জন্য সাত দিন অপেক্ষা করিলেন। কিন্তু রামকুমার ফিরিয়া না আসায় তিনি পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন এবং জানিলেন, তদগ্রজ ভবতারিণীর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় ঝামাপুকুরে রামকুমারের টোল উঠিয়া গেল। গদাধর কালীবাড়ীতে অগ্রজের সহিত মাস খানেক রহিলেন এবং ঠাকুরবাটী

হইতে সিধা লইয়া গঙ্গাতীরে রাঁধিয়া খাইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বয়স প্রায় আঠার বৎসর। দেবালয় প্রতিষ্ঠার দুই তিন মাসের মধ্যেই তিনি প্রথমে ভবতারিণীর বেশকারী এবং তৎপরে রাধাগোবিন্দজীর পূজক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বেশকারী বা পূজক রূপে গদাধর স্বীয় কর্ত্তব্য অতুল দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রামকুমারের নিকট চণ্ডীপাঠ, এবং কালীমাতা ও দেবদেবীর পূজাদি শিখিয়া তিনি দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণ হইয়া উঠিলেন। এইরূপে প্রায় এক বৎসর কাটিল। রোগাক্রান্ত ও জরাগ্রস্ত হওয়ায় রামকুমার কালী-মন্দিরে শ্রমসাধ্য কার্য্য করিতে পারিলেন না। তিনি বিষ্ণুমন্দিরের অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য কার্য্য নিজে লইয়া ১২৬৪ সালে (১৮৫৬ খ্রীঃ) গদাধরকে কালীপূজায় নিযুক্ত করিলেন। ইহাতে মথুরানাথও আনন্দিত হইলেন। রামকুমার ১২৬৭ সালে (১৮৫৯ খ্রীঃ) মূলাজোড়ে কার্য্যোপলক্ষে যাইয়া সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন। কালীমাতার পূজক-পদে ব্রতী হইবার পর গদাধরের জীবনে অভিনব পরিবর্ত্তন আসিল। শাক্তী দীক্ষা না লইয়া দেবীপূজা প্রশস্ত নহে শুনিয়া তিনি কলিকাতার বৈঠকখানা পল্লীস্থ শাক্ত সাধক কেনারাম ভট্টাচার্য্যের নিকট শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত হন। দীক্ষা গ্রহণ কালে তিনি ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে ১৮৫১ খ্রীঃ তাঁহার শাক্তী দীক্ষাগ্রহণ সম্পন্ন হয়।

পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠাগ্রজের দেহত্যাগে গদাধরের হৃদয়ে বৈরাগ্যানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি মানব জীবনের নশ্বরত্ব উপলব্ধি করিয়া জগদম্বার দর্শনলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। পূজান্তে মন্দির মধ্যে জগন্মাতার নিকটে বসিয়া তিনি তন্মনস্ক ভাবে দিন যাপন করিতেন এবং রামপ্রসাদ,

কমলাকান্ত, নরেশচন্দ্র প্রভৃতি সাধকগণ রচিত শাক্ত সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ভক্তিভরে আত্মহারা হইতেন। বাক্যালাপে তিনি তিলমাত্র সময়ের অপব্যয় করিতেন না এবং রাত্রে মন্দির-দ্বার রুদ্ধ হইলে পঞ্চবটীর পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে যাইয়া তত্রস্থ আমলকী বৃক্ষতলে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইতেন। মাতৃসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বুক ভাসিয়া যাইত। যে তাঁহার পূজা দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। তিনি এত তন্ময় হইয়া পূজা করিতেন যে, পূজা-স্থানে কেহ আসিলে বা নিকটে দাঁড়াইয়া কেহ কথা বলিলে তিনি উহা আদৌ টের পাইতেন না। অঙ্গন্যাস ও করন্যাসাদি পূজাঙ্গ সকল অনুষ্ঠান কালে তিনি দেখিতে পাইতেন, উক্ত মন্ত্রবর্ণসমূহ উজ্জ্বলরূপে নিজ দেহে সন্নিবেশিত। ধ্যানকালে তিনি দেখিতেন, সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্না-মার্গ দিয়া সহস্রারে উঠিতেছেন এবং দেহের যে যে অংশকে উক্ত শক্তি ত্যাগ করিতেছেন সেই সেই অংশ নিস্পন্দ অসাড় ও মৃতবৎ হইয়া যাইতেছে। আবার পূজাবিধি অনুসারে যখন পূজক অগ্নিবীজ 'রং' মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক আপনার চতুর্দিকে জল ছিটাইয়া পূজাস্থানকে অগ্নিময় প্রাচীরবেষ্টিত চিন্তা করিতেন, তখন সত্যই দেখিতেন, তাঁহার চারিদিকে অসংখ্য লেলিহান জিহ্বা বিস্তারপূর্বক অগ্নিদেব পূজাস্থানকে সর্ববাধা হইতে রক্ষা করিতেছেন। পূজাকালে পূজকের তন্মনস্ক ভাব ও তেজঃ-পুঞ্জময় শরীর দেখিয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণগণ বলিতেন, যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব নরদেহ ধারণপূর্বক পূজাসনে উপবিষ্ট। রাসমণি ও মথুরানাথ মাঝে মাঝে আসিয়া ঠাকুরের পূজা দেখিতেন এবং মন্তব্য করিতেন, "যেরূপ উপযুক্ত পূজক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভবতারিণী দেবী শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।"

একদিন ভাগিনেয় হৃদয়রাম পঞ্চবটীর পার্শ্বস্থ জঙ্গলে যাইয়া দেখেন ঠাকুর পরিহিত বস্ত্র ও উপবীত পরিত্যাগপূর্বক সুখাসনে ধ্যানমগ্ন! মাতুলকে নগ্নদেহে ধ্যানরত দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জানিতে চাহিলেন। ইহাতে ঠাকুর বলিলেন, "এইরূপে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়। জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, কুল, শীল, মান, জাতি ও অভিমান—এই অষ্ট পাশে আবদ্ধ। তাই পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান না করলে ধ্যান জমে না।" অভিমান নাশপূর্ব্বক যথার্থ দীনতা শিক্ষার জন্য তিনি অশুদ্ধ স্থানকে স্বহস্তে বহু যত্নে পরিষ্কৃত করিতেন। সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন হইবার জন্য একদিন এক হাতে কয়েকটি মুদ্রা ও অন্য হাতে কয়েক খণ্ড লোষ্ট্র গ্রহণপূর্বক 'টাকা মাটি,' 'মাটি টাকা' বলিতে বলিতে তিনি সবই গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। এই ভাবে তিনি গীতোক্ত সমদৃষ্টি সাধনে সিদ্ধ হন। সর্বজীবে শিবজ্ঞান সুদৃঢ় করিবার জন্য তিনি কালীবাড়ীতে কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্টান্ন দেবতার প্রসাদবোধে ভক্ষণ ও মস্তকে ধারণ করিতেন। পরে উচ্ছিষ্ট পত্রাদি মস্তকে বহন করিয়া গঙ্গাতীরে নিক্ষেপপূর্বক স্বহস্তে মার্জনী লইয়া উক্ত স্থান পরিষ্কার করিতেন। এইরূপে স্বীয় অনিত্য দেহ দ্বারা কিঞ্চিৎ দেবসেবা হইল ভাবিয়া তিনি পরমানন্দিত হইতেন।

তাঁহার কালীপূজায় তন্ময়তা এবং দেবীদর্শনার্থ ব্যাকুলতা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। গদাধর ব্যাকুল চিত্তে প্রার্থনা করিতেন, "মা তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্, আমায় তবে কেন দেখা দিবি না? আমি ধন, জন, ভোগসুখ কিছুই চাই না, আমায় দেখা দে।" পূজাধ্যানাদিতে তাঁহার তন্ময়তা এত বাড়িল যে, নির্দিষ্ট কাল

অতিক্রান্ত হইলেও তিনি টের পাইতেন না। পূজাকালে মস্তকে যথাবিধি একটী পুষ্প দিয়াই তিনি হয়ত দুই ঘণ্টা স্থাণুবৎ স্পন্দহীন ভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন। অন্নাদি নিবেদন করিয়া মা কালী আহার করিতেছেন ভাবিয়াই হয়ত তিনি বহুক্ষণ কাটাইলেন। প্রত্যুষে ফুল তুলিয়া স্বহস্তে মালা গাঁথিয়া দেবীকে সাজাইতে তিনি কত সময় ব্যয় করিতেন। অপরাহ্ণে জগন্মাতাকে ভজন শুনাইতে বসিয়া তিনি এত ভাববিহ্বল হইয়া পড়িতেন যে, আরাত্রিকাদির কথা বার বার স্মরণ করাইয়া দিলেও তাঁহার খেয়াল হইত না। ঈশ্বরানুরাগ বৃদ্ধির ফলে তাঁহার আহার ও নিদ্রা কমিয়া গেল। দেহের রক্তপ্রবাহ বুকে ও মাথায় নিরন্তর দ্রুততর বেগে ধাবিত হওয়ায় তাঁহার বুক সর্বদা লাল হইয়া থাকিত এবং চক্ষুদ্বয়ও মধ্যে মধ্যে সজল হইয়া উঠিত। ঈশ্বর-দর্শনার্থ ঐকান্তিক ব্যাকুলতার ফলে পূজা-ধ্যানাদির সময় ব্যতীতও অবশিষ্ট কাল তিনি উক্ত ভাবে অভিভূত থাকিতেন।

একদিন তিনি জগদম্বাকে সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন এবং তাঁহার দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। তিনি বলিতেছিলেন, "মা, এত যে ডাক্‌ছি, তুই কি শুনছিস্ না? রাম-প্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্, আমাকে কি দেখা দিবি না।" মাতৃদর্শন পাইলেন না বলিয়া তাঁহার হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা হইল। জলশূন্য করিবার জন্য লোকে যেমন গাম্‌ছাকে নিঙ্‌ড়াইয়া থাকে তাঁহার হৃদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ মোচড় দিল। তীব্রতম ব্যাকুলতার যন্ত্রণায় তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং জীবন ধারণ অনাবশ্যক মনে করিলেন। কালী-ঘরে যে খড়্‌গ ছিল উহার উপর সহসা তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। খড়্‌গ দ্বারা আত্মহত্যা করিবার জন্য

তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া ছুটিয়া গেলেন। কালীদর্শনের জন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়াছিল। সেই সময় সহসা তিনি মা-কালীর দর্শন পাইলেন এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় ভূপতিত হইলেন। এইরূপ ভাবাবিষ্ট অবস্থায় সেদিন ও পরদিন কাটিল। ঠাকুর বলিতেন, "অন্তরে একটা অননুভূত-পূর্ব-জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম।" ইহাই তাঁহার প্রথম কালীদর্শন।

প্রথম দর্শনের কথা ঠাকুর তাঁহার শিষ্যগণকে পরবর্তী কালে এইভাবে বলিয়াছিলেন, "ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল! কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি? এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃসমুদ্র! যেদিকে যতদূর দেখি চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল উর্মিমালা তর্জন গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে। দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপরে নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল। হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম!" এই অনন্ত জ্যোতিঃসমুদ্রের মধ্যে ঠাকুর বরাভয়করা কালীমূর্তির দর্শনও পাইয়াছিলেন। দর্শনের শেষে যখন তিনি কিঞ্চিৎ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হন তখন তিনি কাতর কণ্ঠে 'মা' 'মা' শব্দ উচ্চারণ করেন। ইহাই শাস্ত্রমতে সবিকল্প সমাধি। ইহার পর চিন্ময়ী কালীমূর্তির অবাধ অবিরাম দর্শন লাভের জন্য ঠাকুরের প্রাণে অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিল। ক্রন্দনাদির বাহ্য প্রকাশ সর্বদা লক্ষিত না হইলেও উহা অন্তরে সদা বিদ্যমান থাকিত। কখনো কখনো উহা এত বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া তিনি ভূমিতে লুটাইয়া পড়িতেন এবং যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে বলিতেন, "আমায় কৃপা কর্, দেখা

দে।" তাঁহার আকুল ক্রন্দন শুনিয়া চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া যাইত। ঠাকুর বলিতেন, "চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্তির ন্যায় অবাস্তব মনে হইত এবং তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের উদয় হইত না। এরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতাম এবং তদ্রূপ হইবার পরেই দেখিতাম, "বরাভয়করা চিন্ময়ী কালীমূর্তি! সেই মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে!"

প্রথম কালীদর্শন লাভের পর ঠাকুর একেবারে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেন। পূজাদি নিত্যকর্ম মন্দিরে যাইয়া করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হৃদয় কোন ব্রাহ্মণের সাহায্যে পূজাদি কার্য্য চালাইয়া লইতেন এবং মাতুল বায়ুরোগগ্রস্থ হইয়াছেন ভাবিয়া ভূকৈলাসের রাজবৈদ্য দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। ঠাকুর যেদিন ভগবদ্দর্শনের ব্যাকুলতায় একেবারে অস্থির বা বাহ্য-জ্ঞানহীন না হইতেন সেদিন পূজাদি করিতে যাইতেন। উক্ত কালে তাঁহার যে সকল শারীরিক ও মানসিক প্রত্যক্ষ হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "মার নাটমন্দিরের ছাদের আলিসায় যে ধ্যানস্থ ভৈরবমূর্তি আছে ধ্যান করিতে যাইবার সময় তাহাকে দেখাইয়া মনকে বলিতাম, ঐরূপ স্থির নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া মার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে হইবে।' ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইতাম, শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকলে, পায়ের দিক হইতে উর্ধে খট্ খট্ করিয়া শব্দ হইতেছে এবং একটার পর একটা করিয়া গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে। কে যেন ভিতর হইতে ঐ সকল স্থান

তালাবদ্ধ করিয়া দিতেছে। যতক্ষণ ধ্যান করিতাম ততক্ষণ শরীর যে একটুও নাড়িয়া চাড়িয়া আসন পরিবর্তন করিয়া লইব, অথবা ইচ্ছামাত্রই ধ্যান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিব বা অন্য কর্মে নিযুক্ত হইব তাহার সামর্থ্য থাকিত না। পূর্ববৎ খট্ খট্ শব্দ করিয়া এবার উপরের দিক হইতে পা পর্য্যন্ত ঐ সকল গ্রন্থি পুনরায় যতক্ষণ না খুলিয়া যাইত ততক্ষণ কে যেন এক ভাবে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিত। ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথম প্রথম খদ্যোৎপুঞ্জের ন্যায় জ্যোতির্বিন্দুসমূহ দেখিতে পাইতাম; কখনো বা কুয়াসার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিঃতে চতুর্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম। আবার কখনো বা গলিত রূপার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃতরঙ্গে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐরূপ দেখিতাম। আবার অনেক সময় চক্ষু চাহিয়াও ঐরূপ দেখিতে পাইতাম। কি দেখিতেছি তাহা বুঝিতাম না। ঐরূপ দর্শন হওয়া ভাল কি মন্দ তাহাও জানিতাম না। মার (জগন্মাতার) নিকট ব্যাকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম, 'মা আমার কি হচ্ছে কিছুই বুঝি না। তোকে ডাকিবার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না। যাহা করিলে তোকে পাওয়া যায়, তুই তাহা আমাকে শিখাইয়া দে। তুই না শিখাইলে কে আর আমাকে শিখাইবে? মা, তুই ছাড়া আমার গতি বা সহায় আর কেহই যে নাই!' এক মনে ঐরূপে প্রার্থনা করিতাম এবং প্রাণের ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করিতাম।"

কালীধ্যানে ঠাকুর এত নিমগ্ন হইলেন যে, বহির্জগৎ তাঁহার নিকট স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইল। উহা তাঁহার নিকট আর পূর্ববৎ বাস্তব রহিল না। মা কালীর চিন্ময়ী মূর্তি তাঁহার নিকট একমাত্র সার

বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হইল। পূজা ও ধ্যানাদি করিতে বসিয়া ঠাকুর ইতোপূর্বে কখনো দেখিতেন, মার হাতখানি বা উজ্জ্বল পাদপদ্ম-দ্বয় বা সৌম্যাৎ সৌম্য হাস্যদীপ্ত স্নিগ্ধ মুখমণ্ডলখানি। এখন পূজা বা ধ্যানের সময় ব্যতীত অন্য সময়ও তিনি স্পষ্ট দেখিতেন, সর্বাবয়ব-সম্পন্না জ্যোতির্ময়ী মা কালী হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, 'এটা কর,' 'ওটা করিস্ না' বলিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন।

পূর্বে মা কালীকে অন্নাদি নিবেদনান্তে তিনি দেখিতেন, মায়ের নয়নত্রয় হইতে জ্যোতিঃরশ্মি লক্ লক্ করিয়া নির্গত হইয়া নিবেদিত আহার্য্যসমুদয় সংস্পর্শ ও উহার সারাংশ গ্রহণপূর্বক পুনরায় নয়ন সমূহে সংহৃত হইতেছে। তিনি এখন দেখিতে পাইতেন, ভোগ নিবেদন করা মাত্র এবং কখনো বা নিবেদনের পূর্বে মা কালী অঙ্গ-জ্যোতিঃতে মন্দির আলোকিত করিয়া সাক্ষাৎ আহারে বসিয়াছেন। কখনো বা তিনি দেখিতেন, জবাবিল্বার্ঘ্য হস্তে লইয়া কালীধ্যান করিতে করিতেই জগন্মাতা নৈবেদ্য গ্রহণ করিলেন। তখন তিনি পূজা সাঙ্গ না করিয়া নৈবেদ্য নিবেদনপূর্বক চীৎকারে বলিয়া উঠিলেন, "রোস্ রোস্ আগে মন্ত্রটা বলি, তার পর খাস্।" পূর্বে ধ্যান-পূজাদির সময় দেখিতেন, সম্মুখস্থ পাষাণময়ী মূর্তিতে জীবন্ত জাগ্রত দেবী সত্তা আবির্ভূতা। এখন মন্দিরে যাইয়া তিনি আর পাষাণময়ী মূর্তিকে দেখিতে পাইতেন না, তৎস্থলে দেখিতেন যাঁহার চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য-ময় তাঁহারই বরাভয়করা চিদ্ঘনমূর্তি তথায় সর্বদা বিরাজিতা! ঠাকুর বলিতেন, "নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, মা সত্য সত্যই নিশ্বাস ফেলিতেছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দির-দেউলে মার দিব্যাঙ্গের ছায়া কখনো পতিত হইতে দেখি

নাই! আপন কক্ষে বসিয়া শুনিয়াছি, মা পাঁয়জোর পরিয়া বালিকার মত আনন্দিতা হইয়া ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপর তলায় উঠিতেছেন। দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছি, সত্যসত্যই মা মন্দিরের দ্বিতলের বারান্দায় আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া কখন কলিকাতা এবং কখন গঙ্গাদর্শন করিতেছেন।"

ঠাকুর যখন কালীঘরে থাকিতেন তখন তো কথাই নাই, অন্য সময়েও তথায় যাইলে এক অনির্বচনীয় দিব্যাবেশ অনুভূত হইত এবং গা ছম্ ছম্ করিত। বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘনপূর্বক তিনি এখন রাগমার্গে মা কালীর পূজাদিতে নিযুক্ত ছিলেন। সেইজন্য পূজাকালে তাঁহার আচরণ সম্পূর্ণ বিপরীত হইত। সযত্নে জবাবিল্বার্ঘ্য সাজাইয়া তিনি প্রথমতঃ উহা দ্বারা নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্বাঙ্গ, এমন কি চরণ পর্য্যন্ত স্পর্শান্তে কালীর পাদপদ্মে অর্পণ করিতেন। কখনো বা মাতালের ন্যায় তাঁহার বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিত এবং তদবস্থায় টলিতে টলিতে তিনি পূজাসন ছাড়িয়া সিংহাসনের উপরে যাইয়া সস্নেহে জগদম্বার চিবুক ধরিয়া আদর, সঙ্গীত, পরিহাস বা আলাপ করিতেন; অথবা দেবীমূর্ত্তির হস্ত ধরিয়া নৃত্য আরম্ভ করিতেন। মা কালীকে অন্নভোগ নিবেদনকালে সহসা তিনি উঠিয়া পড়িতেন এবং থালা হইতে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন লইয়া দ্রুতপদে সিংহাসনে চড়িয়া মা কালীর মুখে দিয়া বলিতেন, "খা মা, খা, বেশ করে খা!" পরে হয়ত বলিতেন, "আমি খাব? আচ্ছা আমি খাচ্ছি।" এই বলিয়া উহার কিয়দংশ নিজ মুখে লইয়া বাকী অংশ পুনরায় মায়ের মুখে দিয়া বলিতেন, "আমি তো খেয়েছি, এইবার তুই খা।" একদিন ভোগ দিবার সময় একটা বিড়াল কালীঘরে আসিয়া 'ম্যাও' 'ম্যাও'

করিয়া ডাকিতে থাকে। ঠাকুর উহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "মা, মা, খাবি মা, খাবি মা?" ইহা বলিয়া ভোগান্ন তাহাকেই খাওয়াইতে লাগিলেন। এক এক রাত্রে জগন্মাতাকে খাটে শয়ন দিয়া তিনি 'আমাকে কাছে শুতে বলছিস্? আচ্ছা, শুচ্ছি,' বলিয়া মা কালীর রৌপ্যময় খাটে কিছুক্ষণ শয়ন করিলেন। কোন কোন দিন পূজাসনে বসিয়া তিনি গভীর ধ্যানে এত নিমগ্ন হইতেন যে, বহুক্ষণ তাঁহার বাহ্য জ্ঞানের লেশমাত্র থাকিত না। প্রত্যূষে তিনি যখন দেবীর মালা গাঁথিবার জন্য বাগানে ফুল তুলিতেন তখনও ভাবাবেশে মা কালীর সহিত কথা কহিতেন, হাসিতেন এবং আদর আবদার ও রঙ্গপরিহাসাদি করিতেন। রাত্রিকালে ঠাকুরের আদৌ নিদ্রা হইত না; সারারাত্রি ভাবের ঘোরে মায়ের সঙ্গে কথা কহিতেন, গান গাহিতেন বা পঞ্চবটীতে যাইয়া ধ্যানমগ্ন হইতেন।

রাগাত্মিকা ভাবভক্তির প্রবল প্লাবনে ঠাকুরের শরীরে এখন হইতে নানা অদ্ভুত বিকার উপস্থিত হইল। সাধনার প্রারম্ভ হইতে তাঁহার যে গাত্রদাহ উপস্থিত হইয়াছিল উহা ক্রমশঃ বাড়িয়া তাঁহাকে অশেষ কষ্ট দিতে লাগিল। গাত্রদাহ যখন অসহ্য হইত তখন তিনি আর্দ্র গামছা মাথায় দিয়া তিন চারি ঘণ্টাকাল গঙ্গাগর্ভে আকণ্ঠ শরীর ডুবাইয়া বসিয়া থাকিতেন। বুকের ভিতর এক মালসা আগুন রাখিলে যেরূপ উত্তাপ ও যন্ত্রণা হয় তখন ঠাকুর তদ্রূপ উত্তাপ স্বদেহে অনুভব করিয়া, অস্থির হইয়া পড়িতেন। পূজাকালে পূজকের দেহস্থ পাপপুরুষ দগ্ধ করিবার বিধি শাস্ত্রে আছে। তন্ত্রমতে উক্ত পাপপুরুষ বামকুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ, কজ্জলপ্রভ, রক্তশ্মশ্রুবিলোচন, খড়্গচর্মধর ও অতি ক্রুদ্ধ ভূতশুদ্ধির সময় ঠাকুর যখন পাপপুরুষ দগ্ধ করিবার জন্য প্রাণায়াম

ও ধ্যানাদি অভ্যাস করিতেন তখন তিনি সত্য সত্যই দেখিতেন পাপপুরুষ দগ্ধ হইয়া গেল। ঠাকুর বলিতেন, "সন্ধ্যাপূজাদি করিবার সময় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে যখন ভিতরের পাপপুরুষ দগ্ধ হইয়া গেল এইরূপ চিন্তা করিতাম তখন কে জানিত, শরীরে সত্য সত্যই পাপপুরুষ আছে এবং উহাকে বাস্তবিক দগ্ধ ও বিনষ্ট করা যায়। সাধনার প্রারম্ভ হইতে গাত্রদাহ উপস্থিত হইল। ভাবিলাম, এ আবার কি রোগ হইল? ক্রমে উহা বাড়িয়া খুব অসহ্য হইয়া উঠিল। নানা কবিরাজী তৈল মাখা গেল, কিন্তু কিছুতেই উহা কমিল না। পরে একদিন পঞ্চবটীতে বসিয়া আছি, সহসা দেখছি কি মিস কাল রং, আরক্তলোচন, ভীষণাকার একটা পুরুষ যেন মদ খাইয়া টলিতে টলিতে (নিজের শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল। পরক্ষণে দেখি কি, আর একজন সৌমমূর্তি পুরুষ গৈরিক পরিয়া ও ত্রিশূল ধরিয়া এইরূপে শরীরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পূর্বোক্ত ভীষণাকার পুরুষকে সবলে আক্রমণপূর্বক নিহত করিল এবং ঐদিন হইতে আমার গাত্রদাহ কমিয়া গেল।" উক্ত ঘটনার পূর্বে ছয় মাস কাল তিনি গাত্রদাহে বিষম কষ্ট পাইতেছিলেন।

অনন্তর সাধনকালের কয়েক বৎসর পরে বারাসত-নিবাসী মোক্তার শ্রীকানাইলাল ঘোষালের সহিত ঠাকুর পরিচিত হন। ঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্য স্বামী শিবানন্দজীর পিতা ছিলেন কানাইলাল। তিনি উন্নত শাক্ত সাধক ছিলেন এবং রাণী রাসমণির আইন-সংক্রান্ত কার্য্যোপলক্ষে কালীবাড়ীতে আসিতেন। ঠাকুরের গাত্রদাহ সাধনজনিত জানিয়া তিনি তাঁহাকে ইষ্ট-কবচ ধারণ করিতে পরামর্শ দেন। তদ্দত্ত

কবচ ধারণের ফলে ঠাকুর চিরতরে গাত্রদাহ-মুক্ত হন। গাত্রদাহের উপশম হইলেও ঠাকুরের ভাব-বিহ্বলতা এতদূর বাড়িল যে, মাতৃ-দর্শন কয়েক মুহূর্ত্ত মাত্র বাধিত হইলেই তিনি মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেন এবং মুখ ঘর্ষণপূর্ব্বক ব্যাকুল ক্রন্দন করিতেন। আছাড় খাইয়া পড়িবার জন্য তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রক্ত-লিপ্ত হইত। ব্যাকুলতার আধিক্যে তাঁহার শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণ ছট্‌ফট্ করিত। ইহা রাগাত্মিকা প্রেমাভক্তির লক্ষণ। বৈধী ভক্তির পরিণতিতে তাঁহার বাহ্য পূজাও ত্যাগ হইল। ঠাকুর বলিতেন, "যেমন গৃহস্থের বধূর যে পর্য্যন্ত গর্ভ না হয় ততদিন তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে সকল জিনিষ খাইতে ও সকল কাজ করিতে দেয়, গর্ভ হইলেই ঐ সকল বিষয়ে একটু আধটু বাধবিচার আরম্ভ হয়। পরে গর্ভ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততই তাহার কাজ কমাইয়া দেওয়া হয়। ক্রমে যখন সে আসন্নপ্রসবা হয়, গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্টাশঙ্কায় তখন তাহাকে আর কোন কাজই করিতে দেওয়া হয় না। পরে যখন তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন ঐ সন্তানকে নাড়াচাড়া করিয়াই তাহার দিন কাটিতে থাকে।"

একদিন পূজাকালে ঠাকুর মথুরানাথ ও হৃদয়রামকে কালী-ঘরে দেখিয়া পূজাসন হইতে সহসা উত্থিত হইলেন এবং ভাবাবেশে হৃদয়ের হাত ধরিয়া পূজাসনে বসাইয়া মথুরানাথকে বলিলেন, "আজ হইতে হৃদয় পূজা করিবে। মা বলিতেছেন, আমার পূজার ন্যায় হৃদয়ের পূজা তিনি সমভাবে গ্রহণ করিবেন।" বিশ্বাসী মথুরানাথ ঠাকুরের বাক্য দেবাদেশরূপে গ্রহণপূর্ব্বক অনন্তর ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র শ্রীরামতারক চট্টোপাধ্যায়কে দেবীপূজক নিযুক্ত করিলেন। ১২৬৫

াালে বা ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রামতারক ওরফে হলধারী দেবীপূজার ভার প্রাপ্ত হন। ১২৬২ সালে ঠাকুর পূজকের পদ গ্রহন করেন। সুতরাং তিনি প্রায় তিন বৎসর পূজাকার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ঠাকুর বায়ুরোগগ্রস্থ জানিয়া মথুরানাথ তাঁহার জন্য মিছরীর সরবৎ এবং কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করেন। গঙ্গাপ্রসাদের অভিজ্ঞ ভ্রাতা দুর্গাপ্রসাদ সেন তখন ঠাকুরকে পরীক্ষান্তে বলিয়াছিলেন, "ইহা যোগজ ব্যাধি। ঔষধে সারিবার নহে। ইঁহার দিব্যোন্মাদ অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে।"

ঠাকুরের সাধক-জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায়, তিনি বাহ্য সহায়তা না পাইলেও সুতীব্র ব্যাকুলতার বলে জগদম্বার সাক্ষাৎলাভ করেন। তাঁহার ব্যাকুলতার যথার্থ ধারণা বা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। অদ্ভূত ব্যাকুলতার প্রাবল্যে তাঁহার আহার, নিদ্রা, লজ্জা, ভয়াদি দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার ও অভ্যাসসমূহ বিলুপ্ত হয় এবং স্বাস্থ্যরক্ষা দূরে থাকুক, জীবনরক্ষার দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি ছিল না। ঠাকুর বলিতেন, "শরীর সংস্কারের দিকে আদৌ মন না থাকায় উক্ত কালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলামাটি লাগিয়া আপনা আপনি জটা পাকিয়া গিয়াছিল। ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা স্থাণুবৎ এমন স্থির হইয়া থাকিত যে, পক্ষীসকল জড় পদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলিরাশি চঞ্চু দ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ করিত। আবার সময়ে সময়ে ভগবৎবিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে, কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত। ঐরূপে ধ্যান ভজন প্রার্থনা আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া সব সময়

চলিয়া যাইত তাহার হুঁসই থাকিত না। পরে সন্ধ্যাসমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খ-ঘণ্টা ধ্বনি হইতে থাকিত তখন মনে পড়িত, দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, স্থির থাকিতে পারিতাম না, আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া 'মা, এখনো দেখা দিলি না' বলিয়া চীৎকার ক্রন্দনে দিক্ পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতাম। লোকে বলিত, পেটের শূল-ব্যথা ধরিয়াছে। তাই এত কাঁদিতেছে।" পরবর্তী কালে ঠাকুর তাঁহার শিষ্যবৃন্দকে ঈশ্বর-দর্শনের জন্য ব্যাকুলতার প্রয়োজন বুঝাইতে যাইয়া বলিতেন, "লোকে পত্নীপুত্রাদির মৃত্যুতে বা বিষয়-সম্পত্তি হারাইয়া ঘটী ঘটী চোখের জল ফেলে। কিন্তু ঈশ্বরলাভ হইল না বলিয়া কে আর ঐরূপ করে বল? অথচ লোকে বলে, তাঁহাকে এত ডাকিলাম, তত্রাচ তিনি দর্শন দিলেন না! ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ব্যাকুল ভাবে একবার ক্রন্দন করুক দেখি, কেমন না তিনি দর্শন দেন।"

ঠাকুর যখন কালীবাড়ীতে থাকিতেন তখন অসংখ্য সাধক ও সিদ্ধপুরুষ তথায় আসিতেন। তন্মধ্যে কাহারো নিকট হইতে হঠ-যোগোক্ত প্রাণায়ামাদি শিক্ষা করিয়া তিনি যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হন। হঠযোগ সাধনপূর্বক উহার ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়া পরবর্তী কালে তিনি তাঁহার শিষ্যগণকে বলিতেন, "ও সকল সাধন এ কালের পক্ষে নয়! কলিতে জীব অল্পায়ু ও অন্নগতপ্রাণ। এখন হঠযোগ অভ্যাস-পূর্বক শরীর দৃঢ় করিয়া লইয়া রাজযোগ সহায়ে ঈশ্বরকে ডাকিবে, তাহার সময় কোথায়? হঠযোগের ক্রিয়াসমূহ অভ্যাস করিতে

হইলে সিদ্ধগুরুর সঙ্গে নিরন্তর থাকিতে হয় এবং আহার-বিহারাদি সকল বিষয়ে তাঁহার উপদেশ লইয়া কঠোর নিয়মাবলী পালন করিতে হয়। নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রমে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত এবং অনেক সময় সাধকের মৃত্যুও হইয়া থাকে। সেইজন্য এই সকল সাধনের আবশ্যকতা এখন নাই। মন নিরোধের জন্যই ত প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি দ্বারা বায়ুনিরোধ করা! ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত ধ্যানে মন ও বায়ু উভয়ই স্বতঃনিরুদ্ধ হইয়া আসিবে। কলিযুগে অল্পায়ু ও অল্প-শক্তি বলিয়া ভগবান কৃপাপূর্বক তাহার ঈশ্বরলাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন! স্ত্রী-পুত্রের বিয়োগে প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলতা ও অভাব-বোধ আসে ঈশ্বরের জন্য সেইরূপ ব্যাকুলতা চব্বিশ ঘণ্টামাত্র কাহারো প্রাণে স্থায়ী হইলে তিনি তাহাকে একালে দেখা দিবেনই দিবেন।”

হলধারী কোন কারণে ভুল বুঝিয়া রুষ্ট হইয়া ঠাকুরকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, “কনিষ্ঠ হইয়া তুই আমাকে অবজ্ঞা করিলি? তোর মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে।” হলধারীর অভিশাপ অচিরে ফলপ্রসূ হইল। একরাত্রে ৮.৯ টার সময় ঠাকুরের তালুদেশ সহসা সড়্‌সড়্‌ করিয়া মুখ দিয়া রক্ত পড়িল। ঠাকুর বলিতেন, “সিম পাতার রসের মত তার মিস্ কাল রঙ্। রক্ত এত গাঢ় যে, কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল এবং কতক মুখের ভিতর জমিয়া গিয়া সম্মুখের দাঁতের অগ্রভাগ হইতে বটের জটের মত ঝুলিতে লাগিল। মুখের ভিতর কাপড় দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তথাপি থামিল না দেখিয়া বড় ভয় হইল। সংবাদ পাইয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। হলধারী তখন মন্দিরে সেবার কাজ

সারিতেছিল। ঐ সংবাদে সেও শশব্যস্তে আসিয়া পড়িল। তাকে বলিলাম, "দাদা, শাপ দিয়া তুমি আমার একি অবস্থা করলে দেখ দেখি ?" আমার কাতরতা দেখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল। কালী-বাড়ীতে তখন এক প্রাচীন সাধু আসিয়াছিলেন। তিনি গোলমাল শুনিয়া সেখানে আসিলেন এবং ঠাকুরের তালুদেশ ও নির্গত রুধির পরীক্ষাপূর্বক বলিলেন, "ভয় নাই, রক্ত বাহির হইয়া বড় ভালই হইয়াছে। দেখিতেছি, তুমি যোগসাধনা করিতে। হঠযোগের চরমে জড়সমাধি হয়। তোমারও ঐরূপ হইয়াছিল। সুষুম্নার দ্বার খুলিয়া যাইয়া শরীরের রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায় না উঠিয়া উহা যে ঐরূপে মুখের ভিতরে একটা নির্গত হইবার পথ আপনা আপনি করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল উহাতে বড়ই ভাল হইল। কারণ, জড়সমাধি হইলে উহা কিছুতেই ভাঙ্গিত না। তোমার শরীরটা দ্বারা জগন্মাতার বিশেষ কোন কার্য্য আছে। তাই জগদম্বা তোমাকে এইরূপে রক্ষা করিলেন।" উক্ত সাধুর কথা শুনিয়া ঠাকুর আশ্বস্ত হইলেন।

একদিন হলধারী মা কালীকে তামসী বলেন এবং তাঁহার আরাধনা করিতে ঠাকুরকে নিষেধ করেন। ইহা শুনিয়া ঠাকুর তখন হলধারীকে কিছু বলিলেন না; কিন্তু ইস্টদেবীর নিন্দা শ্রবণে তিনি অন্তরে ব্যথিত হইলেন। অনন্তর কালীমন্দিরে যাইয়া সজল নয়নে জগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। সে তোকে তমোগুণময়ী বলে। তুই কি সত্যই ঐরূপ ?" মা কালীর মুখে উক্ত বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়া ঠাকুর উল্লসিত অন্তরে হলধারীর নিকট ছুটিয়া গেলেন এবং একেবারে তাঁহার স্কন্ধে চড়িয়া

উত্তেজিত স্বরে বার বার বলিতে লাগিলেন, "তুই মাকে তামসী, বলিস্? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধসত্ত্ব-গুণময়ী!" ঠাকুরের বাক্যে ও স্পর্শে হলধারীর অন্তশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। তখন তিনি পূজাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি ঠাকুরের মধ্যে সাক্ষাৎ কালীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থ ফুলচন্দনাদি দ্বারা ঠাকুরের পাদপদ্ম ভক্তিভরে পূজা করিলেন। কিন্তু তিনি নস্য লইয়া শাস্ত্রবিচারে বসিলেই পাণ্ডিত্যাভিমানে ঠাকুরের প্রতি উক্ত ভাব হারাইতেন। ঠাকুর এখন কাঙ্গালীদিগকে নারায়ণজ্ঞান করিয়া তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেন; উহা দেখিয়া হলধারী বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোর ছেলে মেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ হয় তাহা দেখিব?" পাণ্ডিত্যাভিমানী হলধারীর মুখে এই কথা শুনিয়া ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিলেন, "তবে রে শালা! শাস্ত্রব্যাখ্যা করবার সময় তুই না বলিস, জগৎ মিথ্যা এবং সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়? তুই বুঝি ভাবিস্, আমি তোর মত জগৎ মিথ্যা বল্‌বো, অথচ ছেলেমেয়ের বাপ হবো। ধিক্ তোর শাস্ত্রজ্ঞানে!"

ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিয়া শাস্ত্রবাক্য দ্বারা নির্দেশপূর্বক হলধারী একদিন ঠাকুরের মনে বিষম সন্দেহ সৃষ্টি করেন। শিশু-স্বভাব ঠাকুর হলধারীর কথায় বিশ্বাস করিয়া ভাবিলেন, "তবে ত ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়াছি, আদেশ পাইয়াছি, সে সমস্ত ভুল। মা তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়াছে।" ঠাকুরের মন বড়ই ব্যাকুল হইল। অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি কালীকে বলিতে লাগিলেন, "মা, নিরক্ষর মুখ্‌খু বলে আমাকে কি এম্‌নি করে

ফাঁকি দিতে হয় ?" শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রসঙ্গে বলিতেন, "সে কান্নার তোড় (বেগ) আর থামে না ! কুঠীর ঘরে বসিয়া কাঁদিতে ছিলাম কিছুক্ষণ পরে দেখি কি, সহসা মেজে হইতে কুয়াসার মত ধোঁয় উঠিয়া সাম্‌নের কতকটা স্থান পূর্ণ হইয়া গেল ! তারপর দেখি তাহার ভিতরে আবক্ষলম্বিতশ্মশ্রু একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম মুখ ! ঐ মূর্তি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গম্ভীর স্বরে বললেন, "ওরে তুই ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্।" এই কথা তিন বার মাত্র বলিয়াই উক্ত মূর্ত্তি ধীরে ধীরে আবার কুয়াসায় গলিয়া গেল এবং ঐ কুয়াসার মত ধূমও কোথায় অন্তর্হিত হইল। ঐরূপ দেখিয়া সেবার শান্ত হইলাম।" হলধারীর কথায় আর একবার ঠাকুরের মনে সন্দেহ উঠিয়াছিল। সেবার পূজাকালে ঠাকুর উক্ত বিষয়ের মীমাংসার জন্য সজল নয়নে মা কালীকে ধরিয়াছিলেন। জগদম্বা তখন রতির মা নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের বেশে আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুই ভাবমুখে থাক্।" আবার তোতাপুরী দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিবার পর ঠাকুর যখন ছয় মাস কাল যাবৎ নিরন্তর নির্বিকল্প ভূমিতে বাস করেন তখনও তিনি মা কালীর অশরীরী অভয়বাণী শুনিতে পান, "তুই ভাবমুখে থাক্।"

সাধক জীবনের প্রথম চারি বৎসরের মধ্যেই ঠাকুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা লাভ করেন। উক্ত কালে চন্দন হইতে বিষ্ঠা পর্য্যন্ত সকল পদার্থ পাঞ্চভৌতিক জানিয়া হেয়োপাদেয় জ্ঞান পরিহারার্থ অপরের বিষ্ঠা জিহ্বার দ্বারা নির্বিকার চিত্তে তিনি স্পর্শ করেন। উক্তকালে ধ্যান করিতে বসিয়া তিনি দেখিতেন, শাণিত ত্রিশূলধারী জনৈক

ব্যক্তি দেহমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "অন্যচিন্তাসমূহ পরিত্যাগপূর্বক যদি ইষ্টচিন্তা না করিবি তবে এই ত্রিশূল তোর বুকে বসাইয়া দিব!" সন্ন্যাসী কর্তৃক ঠাকুরের দেহ-নির্গত পাপ-পুরুষ বধের কথাও পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। দূরস্থিত দেবদেবীর মূর্তি দর্শনে অথবা কীর্তনাদি শ্রবণে ঠাকুর অভিলাষী হইলে উক্ত সন্ন্যাসী তাঁহার দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ময় পথে ঐ সকল স্থানে যাইতেন এবং কিছুক্ষণ আনন্দ উপভোগপূর্বক পুনরায় পূর্বোক্ত জ্যোতির্ময় বর্ত্মে ফিরিয়া তাঁহার দেহে প্রবেশ করিতেন। এই সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "আমারই ন্যায় দেখিতে এক যুবক সন্ন্যাসী-মূর্তি ভিতর হইতে যখন তখন বাহির হইয়া আমাকে সকল বিষয় উপদেশ দিত। সে ঐরূপে বাহিরে আসিলে কখনো আমার সামান্য বাহ্য জ্ঞান থাকিত, কখনো বা উহা এককালে হারাইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া কেবল তাহারই চেষ্টা ও কথা দেখিতে ও শুনিতে পাইতাম। তাহার মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম সেই সকল তত্ত্বকথাই ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও তোতাপুরী প্রভৃতি আসিয়া পুনরায় উপদেশ দিয়াছেন। যাহা জানিতাম, তাহাই তাঁহারা জানাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, শাস্ত্রবিধির মান্যরক্ষা করাইবার জন্যই তাঁহারা গুরুরূপে জীবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নতুবা তোতাপুরী প্রভৃতিকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" উপরোক্ত সন্ন্যাসী দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিম্বের ন্যায় ঠাকুরেরই অনুরূপ আকার-বিশিষ্ট। সাধন-কালের প্রায় প্রারম্ভ হইতেই ঠাকুর তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের শুদ্ধ মনই উক্ত সন্ন্যাসীরূপে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেন। তাই ঠাকুর বলিতেন, শুদ্ধ মনই সংযত

সাধকের গুরু হইয়া থাকে। এইরূপে সাধন কালের প্রথম চারি বৎসর ঠাকুর নানা দর্শন লাভ করেন এবং সেই দর্শনসমূহ সম্পূর্ণ সত্য।

ঠাকুরের মাতা চন্দ্রাদেবীও কোন শিবমন্দিরে দুই তিন দিন প্রায়োপবেশনপূর্বক স্বপ্নে দেখিলেন, "মহাদেব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'ভয় নাই, তোমার পুত্র পাগল হয় নাই। ঐশ্বরিক আবেগে তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে।" স্বীয় দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা ঠাকুর পরবর্তী জীবনে তাঁহার শিষ্যবর্গকে এইভাবে বলিতেন, "আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীর মন ঐরূপ হওয়া দূরে থাকুক, উহার এক চতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীর ত্যাগ হয়। দিবারাত্রির অধিকাংশ ভাগ মার কোন না কোন রূপ দর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম, তাই রক্ষা। নতুবা (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলাটা থাকা অসম্ভব হইত। এখন হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিল মাত্র নিদ্রা হয় নাই; চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল। সময় সময় চেষ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না। কত কাল গত হইল তাহার জ্ঞান থাকিত না, এবং শরীর বাঁচাইয়া চলিতে হইবে একথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শরীরের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়িত তখন উহার অবস্থা দেখিয়া বিষম ভয় হইত। ভাবিতাম, পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদানপূর্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উহাতেও পড়ে কি না। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্য হইয়া থাকিত। ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাস-নির্ভর করার কি ঐ ফল হলো? শরীরে বিষম ব্যাধি দিলি! আবার

ারক্ষণেই বলিতাম, যা হবার হোগ গে। শরীর যাক্। তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস্ নি। আমায় দেখা দে, কৃপা কর। আমি যে মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি। তুই ভিন্ন আবার যে অন্য াতি একেবারে নাই। ঐরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে আমার মন অদ্ভুত ৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত। শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় ালিয়া মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয় বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইতাম।”

আড়িয়াদহের কৃষ্ণকিশোর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি পৈতেটা ফেললেন কেন?” তদুত্তরে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, 'যখন আমার এই অবস্থা হলো তখন আশ্বিনের ঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে লয়ে গেল। আগের চিহ্ন কিছুই রহিল না। হুঁস নাই। কাপড় পড়ে যাচ্ছে তা পৈতে থাকবে কেমন করে।··· তামার দিব্যোন্মাদ হয়, তাহলে তুমি বুঝ।”

পঞ্চম অধ্যায়

তন্ত্রসাধন

১২৬৭ সালের শেষ ভাগে (১৮৬১ খ্রীঃ) রাণী রাসমণির মৃত্যুর ল্প কাল পরে যশোহরবাসিনী ভৈরবী ব্রাহ্মণী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বর ালীবাড়ীতে শুভাগমন করেন। তিনি যখন নহবতের সন্নিকটে কুলতলার বাঁধাঘাটে নৌকা হইতে নামিলেন ঠাকুর তখন পোস্তার

উপরে বাগানে ফুল তুলিতেছিলেন। ঠাকুর তখন পূজা না করিলেও প্রাতে ফুল তুলিয়া ও মালা গাঁথিয়া জগদম্বাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। অপরিচিতা সন্ন্যাসিনীকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে নিকট আত্মীয়তুল্যা অনুভব করিলেন। ভৈরবী ইতোপূর্বে চাঁদনীতে যাইয়া বসিয়াছিলেন। ঠাকুরের নির্দেশে হৃদয় তাঁহাকে চাঁদনী হইতে ডাকিয়া আনিলেন। ঠাকুরের ঘরে যাইয়া ভৈরবী তাঁহাকে দেখিয়াই আনন্দিতা ও বিস্মিতা হইলেন এবং সজল নয়নে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুমি এখানে রহিয়াছ। তুমি গঙ্গাতীরে আছ জানিয়া তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতে-ছিলাম। এতদিনে তোমার দেখা পাইলাম।" ঠাকুর ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার কথা কেমন করিয়া জানিতে পারিলে মা?" ভৈরবী উত্তর দিলেন, "তোমাদের তিন জনের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, একথা পূর্বে জগদম্বার কৃপায় জানিতে পারিয়াছিলাম। দুই জনের* দেখা পূর্ব দেশে (বঙ্গে) পাইয়াছি, আজ এখানে তোমার দেখা পাইলাম।"

ঠাকুর তখন স্বীয় নিদ্রাশূন্যতা, গাত্রদাহ, অলৌকিক দর্শনাদির কথা তাঁহাকে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ গা, আমার এ সকল কি হয়? আমি কি সত্যই পাগল হইলাম? জগদম্বাকে মনে প্রাণে ডাকিয়া সত্যই কি আমার কঠিন ব্যাধি হইল?" জননী যেমন সন্তানকে সান্ত্বনা দেন তেমনি ভৈরবী ঠাকুরকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তোমায় কে পাগল বলে বাবা? তোমার ইহা পাগলামী নয়, তোমার মহাভাব হইয়াছে।..."বাক্যালাপের পর ভৈরবী দেবত

*চন্দ্র ও গিরিজা

দর্শন ও জলযোগ করিয়া কণ্ঠস্থিত রঘুবীর শিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাড়ীর ভাণ্ডার হইতে আটা প্রভৃতি সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে যাইয়া রন্ধনাদিতে ব্যাপৃত হইলেন। রন্ধনাদি সমাপ্ত হইলে তিনি রঘুবীরের সম্মুখে খাদ্যাদি রাখিয়া ইষ্টধ্যানে মগ্ন হইয়া এই অভূতপূর্ব দর্শনলাভ করিলেন যে, রঘুবীরই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে স্থূল দেহে অবতীর্ণ। ঠাকুরও তখন ভাবাবিষ্ট হইয়া তথায় আসিলেন এবং ভৈরবী কর্তৃক নিবেদিত অন্নাদি খাইতে লাগিলেন। ভৈরবী ধ্যানান্তে তন্নিবেদিত অন্নাদি ঠাকুরকে গ্রহণ করিতে দেখিয়া কণ্টকিত-কলেবরা হইলেন, এবং জীবন্ত ইষ্টদেবের প্রসাদ গ্রহণপূর্বক চির-পূজিত রঘুবীর শিলাটী গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিলেন। ছয় সাত দিন্ পঞ্চবটীতে থাকিয়া তিনি দক্ষিণেশ্বর গ্রামস্থ দেবমণ্ডলের ঘাটে আসন পাতিলেন এবং স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র নীয়োগীর ধর্মপ্রাণা পত্নীর সেবা গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের দিব্যভাব ও মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধি দেখিয়া ভৈরবীর সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল যে, ঠাকুর ঈশ্বরাবতার। চৈতন্যচরিতামৃত এবং চৈতন্যভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, মহাপ্রভু জীবোদ্ধারের জন্য পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন। উক্ত শাস্ত্রীয় ইঙ্গিত ভৈরবীকে পূর্বোক্ত ধারণার বশবর্তী হইতে প্রেরণা দিল। তিনি দেখিলেন, চৈতন্যদেবের ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণও ভাবাবেশে অপরকে স্পর্শমাত্র দ্বারা ধর্মভাবে উদ্‌বুদ্ধ করিতে সমর্থ। তিনি দেখিলেন, ঈশ্বর-বিরহ-জনিত গাত্রদাহ মহাপ্রভুর ন্যায় ঠাকুরেরও প্রশমিত হইল পুষ্পমাল্য ও চন্দনাদি ব্যবহারে। তিনি শুনিলেন, কামারপুকুর হইতে সিহড় যাইবার কালে ঠাকুরের দেহাভ্যন্তর হইতে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই সকল ঘটনা হইতে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর

গভীর বিশ্বাস জন্মিল যে, শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ উভয়েই একাধারে শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ। তাঁহার অপূর্ব বিশ্বাস ঠাকুরের কাছে শুনিয়া মথুরানাথ বলিয়াছিলেন, "বাবা! অবতার ত দশটী ছাড়া আর নাই।" ইহাতে বিদুষী ব্রাহ্মণী শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদি হইতে বাক্যোদ্ধৃতি দ্বারা ঠাকুরের অবতারত্ব প্রমাণিত করিলেন।

ভৈরবীর নির্দেশে মথুরানাথ বীরভূম জেলার অন্তর্গত ইঁদেশের তান্ত্রিক সাধক গৌরী পণ্ডিত এবং কলিকাতা চৈতন্য সভার অধ্যক্ষ বৈষ্ণবচরণ প্রভৃতিকে নিমন্ত্রণপূর্বক দক্ষিণেশ্বরে একটী পণ্ডিতসভা আহ্বান করিলেন। কালী মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট মন্দিরে উক্ত সভা বসিল পূর্বাহ্নে। কলিকাতা হইতে আসিতে বৈষ্ণবচরণের বিলম্ব হইতেছিল। সেইজন্য ঠাকুর গৌরী পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া অগ্রেই সভাস্থলে চলিলেন। তিনি নাটমন্দিরে যাইবার পূর্বে কালীমন্দিরে জগন্মাতাকে দর্শন ও প্রণামান্তে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন বৈষ্ণবচরণ সমাগত এবং তাঁহার চরণে প্রণত। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তখন বৈষ্ণবচরণের স্কন্ধদেশে বসিয়া পড়িয়া সমাধিস্থ হইলেন। কৃপাপ্রাপ্ত বৈষ্ণবচরণ তখন আনন্দে উল্লসিত হইয়া তৎক্ষণেই সংস্কৃত শ্লোক রচনাপূর্বক ঠাকুরকে স্তব করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সমাধিস্থ ভাবোজ্জ্বল মূর্তি দর্শনে এবং বৈষ্ণবচরণের ভক্তিপূর্ণ স্তবপাঠ শ্রবণে সমবেত মথুরানাথ এবং অন্যান্য সকলে স্তম্ভিত হইলেন। ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইলে সভা বসিল। প্রথম দর্শনেই বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরকে মহাপূরুষ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। এখন ঠাকুরের সমাধি ও মহাভাব দেখিয়া তিনি বলিলেন, "যে প্রধান প্রধান ঊনবিংশ প্রকার ভাব বা অবস্থার সম্মিলনকে ভক্তিশাস্ত্র মহাভাব বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন

এবং যাহা কেবল মাত্র ভাবময়ী শ্রীরাধিকার ও ভগবান্ শ্রীচৈতন্য-দেবের জীবনেই এ পর্য্যন্ত লক্ষিত হইয়াছে, কি আশ্চর্য্য! তাহার সকল লক্ষণই (ঠাকুরকে দেখাইয়া) ইঁহাতে প্রকাশিত বলিয়া বোধ হইতেছে।"

বৈষ্ণব চরণের কথা শুনিয়া মথুরানাথ প্রভৃতি সকলে অবাক্ হইলেন। গৌরী পণ্ডিত সভায় বলিলেন, "উঁহারও (বৈষ্ণবচরণের) যাহা ধারণা, আমারও তাহাই।" অতঃপর কিছুক্ষণ শাস্ত্রালোচনার পর সভাভঙ্গ হইল। পণ্ডিত-সভায় ঠাকুরের অবতারত্ব প্রমাণিত হইবার পর তাঁহাকে সকলে এখন হইতে অন্য চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

তপঃপ্রসূত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সহায়ে গৌরী পণ্ডিত বুঝিলেন, "ঠাকুর মহাপুরুষ ও ঈশ্বরাবতার।" ইহার কিছুদিন পরে ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, বৈষ্ণবচরণ (নিজের শরীর দেখাইয়া) একে অবতার বলে। এটা কি হতে পারে? তোমার কি বোধ হয় বল দেখি?" গৌরী পণ্ডিত গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন, "বৈষ্ণব চরণ আপনাকে অবতার বলে? তবে ত ছোট কথা বলে। আমার ধারণা, যাঁহার অংশ হইতে অবতারেরা যুগে যুগে লোক-কল্যাণ সাধনে জগতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং যাঁহার শক্তিতে তাঁহারা ঐ কার্য্য সাধন করেন, আপনি তিনিই!" গৌরী পণ্ডিতের অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা শুনিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন। তাঁহার বিবেক ও বৈরাগ্য ঠাকুরের সংসর্গে বহু গুণে বর্ধিত হইল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাভার্থ তপস্যায় গমন করিলেন। বিদায়কালে ঠাকুরকে বলিলেন, "আশীর্বাদ করুন যেন অভিষ্ট সিদ্ধ হয়। ঈশ্বর লাভ না করিয়া আর সংসারে ফিরিব না।" পরবর্তী জীবনে ঠাকুর গৌরী পণ্ডিত ও

বৈষ্ণবচরণের উক্তি কথাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করিতেন এবং বলিতেন, "গৌরী বলত, 'কালী ও কৃষ্ণে অভেদ বুদ্ধি হলে পাকা জ্ঞান হয়।' আর বৈষ্ণবচরণ বলত, 'নরলীলায় বিশ্বাস পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ।"

তীব্র ব্যাকুলতা ও বৈরাগ্যের ফলে ঠাকুর যে সকল অপূর্ব অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন সে গুলিতে তাঁহার কখনো কখনো সন্দেহ হইত। তিনি ভাবিতেন, হয়ত মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফলে তাঁহার ঐরূপ প্রত্যক্ষ হইতেছে। এই সকল সন্দেহ হইতে নির্মুক্ত হইবার জন্য তিনি তন্ত্র সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং ভৈরবী ব্রাহ্মণীও তাঁহাকে উহাতে প্রভূত উৎসাহ দিলেন। ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে সকল প্রকার তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ঠাকুরও উক্ত কর্য্যে জগদম্বার অনুমতি পাইলেন এবং পূর্ণাগ্রহে সাধন-পথে ধাবিত হইলেন। বেলতলায় এবং পঞ্চবটীতে দুইটী সাধনানুকুল পঞ্চমুণ্ডাসন নির্মিত হইল। এই দুই সাধন-বেদিকায় বসিয়া ঠাকুর বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যে সকল প্রধান সাধনের কথা আছে সেগুলিতে একে একে সিদ্ধ হইলেন। যে সকল কঠিন সাধন করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয় সেইগুলিতে তিনি জগদম্বার কৃপায় অচিরে উত্তীর্ণ হইলেন। কয়েক মাস ধরিয়া দিবারাত্র কি ভাবে অতিবাহিত হইল ঠাকুর বা ব্রাহ্মণী কেহই বুঝিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণী দিবাভাগে নানা দূর স্থানে যাইয়া তন্ত্রোক্ত দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিতেন এবং রাত্রিকালে বিল্বমূলে বা পঞ্চবটীতলে ঠাকুরের দ্বারা কালীপূজা ও জপধ্যানাদি করাইতেন। কিন্তু পূজান্তে প্রায়ই তিনি জপ করিতে পারিতেন না। তাঁহার মন এত তন্ময় হইয়া যাইত যে, মালা ফিরাইতে যাইয়া তিনি সমাধিস্থ

হইয়া পড়িতেন এবং উক্ত সাধনার ফল প্রাপ্ত হইতেন। তন্ত্রসাধন কালে তিনি যে কত দর্শন ও অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

এক রাত্রিতে ব্রাহ্মণী একটী পূর্ণযৌবনা সুন্দরী রমণীকে কোথা হইতে ডাকিয়া আনিলেন এবং পূজার আয়োজনপূর্বক পূজ্যা দেবীর আসনে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিয়া বসাইলেন। অনন্তর ইঁহাকে দেবী-জ্ঞানে পূজা করিবার জন্য ঠাকুরকে নির্দেশ দিলেন। ঠাকুর ব্রাহ্মণীর নির্দেশ কার্য্যে পরিণত করিলেন। পূজা সাঙ্গ হইলে ভৈরবী ঠাকুরকে বলিলেন, "বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী জ্ঞানে ইঁহার ক্রোড়ে বসিয়া তন্ময় চিত্তে জপ কর।" ভৈরবীর নির্দেশ শুনিয়া ঠাকুর আতঙ্কে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং জগদম্বাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা, তোর শরণাগতকে একি আদেশ করিতেছিস্! দুর্বল সন্তানের এরূপ দুঃসাহসের সামর্থ্য কোথায়?" এইরূপ প্রার্থনায় তাঁহার হৃদয় দিব্য বলে পরিপূর্ণ হইল। তখন তিনি দেবতাবিষ্টের ন্যায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে বসিয়াই সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন! যখন তাঁহার বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন ব্রাহ্মণী তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে। অপরে এই অবস্থায় অতি কষ্টে ধৈর্য্যধারণপূর্বক কিছু কাল জপমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয়। আর তুমি এক কালে শরীর বোধশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলে।" ইহা শুনিয়া ঠাকুর আশ্বস্ত হইলেন এবং কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বারম্বার জগদম্বাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

আর একদিন ব্রাহ্মণী শবের খর্পরে মৎস্য রাঁধিয়া জগদম্বাকে তর্পণ করিলেন এবং ঠাকুরকেও তদ্রূপ করাইয়া উহা গ্রহণ করিতে বলিলেন। ঠাকুর উহা অম্লান বদনে গ্রহণ করিলেন, ইহাতে তাঁহার

মনে বিন্দুমাত্র ঘৃণার উদয় হইল না। ঘৃণা ত্যাগের জন্য ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে গলিত গোমাংসও এইরূপে খাওয়াইয়া ছিলেন। এক দিন ব্রাহ্মণী গলিত আম মহামাংস খণ্ড আনিয়া জিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিবার জন্য ঠাকুরকে বলিলেন। ইহাতে ঘৃণায় বিচলিত হইয়া ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "তা কি কখনো করা যায়?" ইহা শুনিয়া ভৈরবী বলিলেন, "সে কি বাবা! এই দেখ, আমি করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি উহা নিজ মুখে গ্রহণ করিলেন এবং উহার কিয়দংশ ঠাকুরের সম্মুখে পুনরায় ধরিলেন। তখন ঠাকুরের মধ্যে প্রচণ্ড চণ্ডিকার ভাব উদ্দীপিত হইল এবং তিনি 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণী ঠাকুরের মুখে আম মাংস দিলেন; কিন্তু উহাতে ঠাকুরের মনে আদৌ ঘৃণার উদয় হইল না।

ঠাকুর ব্রাহ্মণীর নিকট পূর্ণাভিষেক বা তান্ত্রিক সন্ন্যাস গ্রহণান্তর তন্ত্র-সাধনে প্রবৃত্ত হন। পূর্ণাভিষিক্ত হইবার পর তিনি যে কত প্রকার তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। আনন্দাসনে সিদ্ধিলাভের জন্য ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে নিম্নোক্ত সাধনে সিদ্ধ করিলেন। ঠাকুর সুরত-ক্রিয়া-সক্ত নরনারীর সম্ভোগানন্দ দর্শনপূর্বক উহা শিবশক্তির লীলাবিলাস জ্ঞানে বিমুগ্ধ ও সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তিনি যখন বাহ্য সংজ্ঞা লাভ করিলেন তখন ব্রাহ্মণী তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, তুমি আজ আনন্দাসনে সিদ্ধ হইয়া দিব্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে। উহাই বীর ভাবের শেষ সাধন।" উহার অল্প কাল পরে কোন ভৈরবীকে পাঁচ সিকা দক্ষিণা দানে প্রসন্না করিয়া তাঁহার সহায়ে কালীঘরের নাটমন্দিরে দিনের বেলা সর্বজন সমক্ষে কুলাগার পূজার যথাবিধি অনুষ্ঠানপূর্বক তিনি বীর ভাবের সাধন সম্পূর্ণ করেন।

দীর্ঘকাল তন্ত্র সাধন কালে রমণীমাত্রে তাঁহার মাতৃভাব অক্ষুণ্ণ হইয়াছিল এবং তিনি বিন্দুমাত্র কারণ (মদ) গ্রহণ করেন নাই। কারণের নাম বা গন্ধমাত্রেই তিনি জগৎকারণের উপলব্ধিতে আত্মহারা হইতেন এবং 'যোনি' শব্দ শ্রবণ মাত্রেই জগৎ-যোনির উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেন। নারী বা কারণ গ্রহণ না করাই ছিল তন্ত্রসাধনে ঠাকুরের বিশেষত্ব। ইহা হইতে প্রমাণিত হয়, পঞ্চ 'ম' কার বা নারীগ্রহণ তন্ত্রসাধনের অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে। ঠাকুর নিজমুখে বারম্বার তাঁহার শিষ্যগণকে বলিয়াছিলেন যে, আজীবন তিনি কখনো স্বপ্নেও স্ত্রীগ্রহণ করেন নাই। ইহাই ছিল ঠাকুরের অন্যতম অলৌকিকত্ব বা অপূর্বত্ব।

১২৬৭ সালের শেষ ভাগ হইতে ১২৬৯ সালের শেষাংশ পর্য্যন্ত দুই তিন বৎসর ঠাকুর তান্ত্রিক সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিলেও সেগুলির কোন আদ্যোপান্ত বিবরণ পাওয়া যায় না। কোন সাধনে সিদ্ধকাম হইতে তাঁহার পক্ষে তিন দিনের অধিক সময় লাগে নাই। সাধনবিশেষ গ্রহণপূর্বক উহার ফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তিনি জগদম্বাকে ধরিয়া বসিতেন এবং তিন দিনের মধ্যেই উহাতে সিদ্ধ হইতেন। তান্ত্রিক সাধনসমূহের অনুষ্ঠানকালে তাঁহার যে সকল অলৌকিক দর্শন ও অনুভব লাভ হইয়াছিল তন্মধ্যে কয়েকটী নিম্নে বিবৃত হইল। তান্ত্রিক সাধনকালে তাঁহার নিষ্ঠাবান্ স্বভাবের আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। জগদম্বা কখনো কখনো শিবারূপ পরিগ্রহ করেন এবং কুক্কুর ভৈরবের বাহন জানিয়া তিনি তখন শিবানীর উচ্ছিষ্ট আহারকে বিশুদ্ধ আহার্য্য বোধে গ্রহণ করিতেন। ইহাতে তাঁহার মনে কোনরূপ দ্বিধা হইত না। জগদম্বার পাদপদ্মে দেহ, মন ও প্রাণ আহুতি দিয়া তিনি নিজেকে অন্তরে ও বাহিরে সর্বদা

জ্ঞানাগ্নি দ্বারা পরিব্যাপ্ত দেখিতেন। তাঁহার কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইয়া মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত উঠিবার কালে প্রত্যেক চক্রের পদ্ম উর্ধ্বমুখ ও প্রস্ফুটিত হইত এবং অপূর্ব অনুভব আসিত। এক জ্যোতির্ময় দিব্য পুরুষ সুষুম্নার মধ্য দিয়া ঐ সকল পদ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া জিহ্বা দ্বারা স্পর্শপূর্বক উহাদিগকে প্রস্ফুটিত করিতেন। ঠাকুর বলিতেন, "কুণ্ডলিনী সড় সড় করিয়া মূলাধার থেকে মাথায় গিয়ে উঠে। যতক্ষণ না সেটা মাথায় উঠে ততক্ষণ হুঁস থাকে। যেই সেটা মাথায় গিয়ে উঠলো আর একেবারে বেবভুল হয়ে যাই। তখন আর দেখা শোনাই থাকে না, তা কথা কওয়া! কথা কইবে কে? 'আমি', 'তুমি' এ বুদ্ধিই চলে যায়। যতক্ষণ সেটা হৃদয় বা বড় জোর কণ্ঠ অবধি উঠে ততক্ষণ কথা বলা চলে ও বল। আর যেই সেটা কণ্ঠ ছাড়িয়ে উঠে অমনি কে যেন মুখ চেপে ধরে, মন হুস্ করে উপরে উঠে যায়, আর কথা বলা যায় না।" ঠাকুর কতদিন নির্বিকল্প সমাধির কথা বলিবার অশেষ প্রয়াস করিয়াও অক্ষম হইয়াছেন। তিনি বলিতেন, "ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে মন উঠিলেই পরমাত্মার দর্শন হয় ও জীবের সমাধি লাভ হয়। তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে কেবল একটী স্বচ্ছ পাতলা পর্দামাত্র ব্যবধান থাকে।" তিনি আরো বলিতেন, সুষুম্নার পথে কুণ্ডলিনী শক্তির উর্ধগতি পাঁচ প্রকারের হইয়া থাকে—পিপীলিকাগতি, ভেকগতি, সর্পগতি, পক্ষীগতি ও বানর গতি। অবশ্য একথা শাস্ত্রেও আছে। তবে তিনি উহা স্বীয় জীবনে বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

বিল্বমূলে সাধনকালে ঠাকুর ব্রহ্মযোনি দর্শন করিয়াছিলেন। তখন তিনি দেখিয়াছিলেন, "জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময় বিচিত্র সুবৃহৎ ত্রিকোণ

প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে। তিনি অনাহত ধ্বনিও শুনিতে পাইতেন। তিনি শুনিতেন, বিশ্বান্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ ধ্বনি-সমূহ একত্রিত হইয়া এক বিরাট প্রণবধ্বনি জগতের সর্বত্র সর্বদা স্বতঃই উঠিতেছে। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস ইহাকে Music of the Spheres বলিতেন। ঠাকুর পশু পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জন্তুদিগের ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনির যথাযথ অর্থবোধ করিতে পারিতেন। স্ত্রীযোনির মধ্যে তিনি জগদম্বাকে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিতা দেখিতেন। তন্ত্রমতে ইহাই কুলা-গারে ৺দেবীদর্শন। তন্ত্রসাধনের শেষে তিনি যোগশাস্ত্রোক্ত অণিমাদি অষ্টসিদ্ধির অধিকারী হন। তাঁহার সেবক ও ভাগিনেয় হৃদয়রাম তাঁহাকে ঐ সকল যোগসিদ্ধি ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন। সেই-জন্য তিনি ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে জগদম্বার নিকট জিজ্ঞাসা করেন। জগদম্বা তাঁহাকে দেখাইয়া দেন যে, ঐ গুলি বেশ্যা-বিষ্ঠাতুল্য অতি হেয় ও সর্বতোভাবে পরিত্যজ্য। তখন হইতে অষ্ট সিদ্ধিকে তিনি মলমূত্রবৎ ঘৃণা করিতেন। একদিন পঞ্চবটীতলে নির্জনে স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, "দ্যাখ, আমাতে প্রসিদ্ধ অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত রহিয়াছে। কিন্তু আমি ঐ সকলের প্রয়োগ কখনো করিব না। ইহা আমি বহু পূর্ব হইতে নিশ্চয় করিয়াছি। উহাদিগের প্রয়োগ করিবার আমার কোন আবশ্যকতাও দেখি না। তোকে ধর্মপ্রচারাদি অনেক কার্য্য করিতে হইবে। তোকেই এই সকল দান করিব, স্থির করিয়াছি। গ্রহণ কর।" কিন্তু স্বামিজী যখন ঠাকুরের নিকট জানিতে পারিলেন যে, এই সকল সিদ্ধি তাঁহাকে ঈশ্বরলাভে সহায়তা করিবে না তখন তিনি ঐ সকল গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন।

তন্ত্রসাধন কালে জগদম্বার মোহিনী মায়া সন্দর্শনের ইচ্ছা ঠাকুরের মনে সমুদিত হয়। তাঁহার শুভেচ্ছা এইভাবে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী-মূর্তি গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া সুধীর পদক্ষেপে পঞ্চবটীতে আসিলেন। সেই দেবী পূর্ণগর্ভা ছিলেন। তিনি ঠাকুরের সম্মুখেই একটী সুন্দর কুমার প্রসবপূর্বক উহাকে কত স্নেহে স্তন্য দান করিলেন। পরক্ষণেই সেই দেবী কঠোরচিত্তা ও করালবদনা হইয়া স্বীয় গর্ভজাত শিশুকে গ্রাস করিয়া গঙ্গাসলিলে নিমজ্জিতা হইলেন। তন্ত্রশাস্ত্র মতে ইনিই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বিশ্বপ্রসবিনী মহামায়া। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে ইঁহার স্বরূপ বিস্তৃত ভাবে বর্নিত।

পূর্বোক্ত দর্শনসমূহ ব্যতীত ঠাকুর এই কালে দশভূজা হইতে দ্বিভূজা পর্য্যন্ত অসংখ্য দেবীমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে কোন কোন দেবীমুর্তি তাঁহাকে নানা ভাবে উপদেশ দিতেন। উক্ত মূর্তিসমূহের মধ্যে প্রত্যেকেই অপূর্বস্বরূপা হইলেও রাজ রাজেশ্বরী দেবীমূর্তিই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী। রাজরাজেশ্বরী বা ষোড়শী দেবীমূর্তির সৌন্দর্য্যের সহিত অন্য কোন দেবীরূপের তুলনা হয় না। ঠাকুর বলিতেন, "ষোড়শী বা ত্রিপুরা মূর্তির অঙ্গ হইতে রূপ-সৌন্দর্য্য গলিত হইয়া চতুর্দিকে পতিত ও বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছি।" এতদ্ব্যতীত নানা দেবীর দর্শনও তিনি এই সময়ে পাইয়াছিলেন। "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" রচয়িতা স্বামী সারদানন্দ বলেন "অলৌকিক দর্শন ও অনুভব সকল ঠাকুরের জীবনে তন্ত্রসাধনকাল হইতে নিত্য এতই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সম্যক্ উল্লেখ করা মনুষ্য শক্তির সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদের প্রতীতি হইয়াছে।"

তন্ত্রসাধনের ফলে ঠাকুরের সুষুম্না-দ্বার পূর্ণ ভাবে উন্মুক্ত হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি বালকবৎ সরল অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। উক্ত কালের শেষাংশ হইতে তিনি পরিহিত বস্ত্রাদি ও যজ্ঞসূত্র চেষ্টা করিলেও অঙ্গে ধরিয়া রাখিতে পারিতেন না। ঐ সকল যে কখন কোথায় পড়িয়া যাইত তাহা তিনি টের পাইতেন না। জগদম্বার সতত ধ্যানে তাঁহার দেহ-বোধ লুপ্ত হওয়ায় তিনি উক্তরূপ বালকভাব প্রাপ্ত হন। প্রকৃত পক্ষে তিনি তখন হইতেই পরমহংসত্ব লাভ করেন। উপনিষদে আছে, পরমহংস বালকবৎ আচরণ করেন। ঠাকুর নিজেকে জগদম্বার শিশু সন্তান বলিয়া সর্বত্র সর্বদা মনে করিতেন। তন্ত্রসাধনের অন্তকালে সর্বভূতে তাঁহার অদ্বৈত বুদ্ধি এত সুদৃঢ় হইয়াছিল যে, বাল্যকাল হইতে তিনি যাহাকে হেয় ও নগণ্য বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিতেন তাহাকেও মহাপবিত্র বস্তুতুল্য দেখিতেন। তিনি বলিতেন, "তখন তুলসী ও সজিনা গাছের পত্র সমভাবে পবিত্র মনে হইত। উক্ত কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েক বৎসর তাঁহার অদ্ভুত দিব্য কান্তি লাভ হইয়াছিল। ঐরূপ অঙ্গকান্তির জন্য সর্বদা সর্বত্র বহুলোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। সেইজন্য তিনি বিরক্ত হইয়া জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করেন, "মা, আমার এ বাহ্য রূপের কোন প্রয়োজন নাই। উহা লইয়া তুই আমাকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর।" শ্রীশ্রীমা বলিতেন, "ঠাকুর স্বীয় অঙ্গে যে সুবর্ণ ইষ্ট-কবচ পরিতেন উহার সোনার রঙ এবং তাঁহার গায়ের উজ্জ্বল রঙ মিলিয়া যেন এক হইয়া যাইত।" ঠাকুর নিজেও বলিতেন, "তখন তখন এমন রূপ হয়েছিল রে, যে লোকে চেয়ে থাকতো। বুক মুখ সব সময় লাল হয়ে থাকত, আর গা দিয়ে যেন একটা জ্যোতিঃ বেরুত!

লোকে চেয়ে থাকত বলে একখানা মোটা চাদর সর্বক্ষণ মুড়ি দিয়ে থাকতুম, আর মাকে বলতুম, "মা, তোর বাহিরের রূপ তুই নে, আমাকে ভিররের রূপ দে।" গায় হাত বুলিয়ে চাপড়ে চাপড়ে বলতুম, ভিতরে ঢুকে যা, ভিতরে ঢুকে যা। তবে কতদিন পরে উপরটা এই রকম মলিন হয়ে গেল।"

ঠাকুর তাঁহার তান্ত্রিক গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে যোগমায়ার অংশভূতা বলিয়া নির্দেশ করিতেন। ভৈরবী ঠাকুরকে বৈষ্ণব সাধনেও সাহায্য করেন এবং তৎপরে প্রায় দ্বাদশ বর্ষ দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন। তিনি ঠাকুরের সহিত কামারপুকুরেও গিয়াছিলেন। তিনি বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত বাৎসল্য ভাবসাধনেও নিযুক্ত হইতেন। দেবমণ্ডলের ঘাটে অবস্থান কালে ঠাকুরের প্রতি বাৎসল্য-রসে আপ্লুত হইয়া যখন তিনি নয়নাশ্রুতে বসন সিক্ত করিতে করিতে 'গোপাল' 'গোপাল' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, তখন ঠাকুর কালীবাড়ী হইতে দুই মাইল পথ ছুটিয়া তাঁহার কাছে যাইতেন এবং মাতৃসমীপে সন্তানতুল্য বসিয়া ননী খাইতেন। কখনো বা ব্রাহ্মণী নানা ভক্ষ্য দ্রব্য হাতে করিয়া কালী বাড়ীতে আসিতেন এবং ঠাকুরকে সেই সব খাওয়াইতেন। ঠাকুর বলিতেন, ব্রাহ্মণীর আলুলায়িত কেশ এবং ভাববিহ্বল মূর্তি দর্শনে তাঁহাকে গোপাল-বিরহ-বিধুরা নন্দরাণী যশোদা বলিয়া লোকের মনে হইত। ব্রাহ্মণী তাঁহার অন্য দুই শিষ্য চন্দ্র ও গিরিজাকে দক্ষিণেশ্বরে আনাইয়া ঠাকুরের সহিত আলাপ করাইয়া দেন। চন্দ্র ও গিরিজার অদ্ভুত যৌগিক বিভূতি ছিল। ঠাকুর তাঁহাদের সিদ্ধাই নাশপূর্বক তাঁহাদের মন ঈশ্বরমুখী করিয়া দেন। স্বশিষ্য ঠাকুরের নিকট ভৈরবী অধ্যাত্ম জীবনে অপূর্ব প্রেরণা প্রাপ্ত হন এবং অবশিষ্ট

জীবন তীর্থভ্রমণ ও তপস্যায় কাটাইবার জন্য চিরতরে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করেন।

ঠাকুর গুরুভাবে কিরূপে তাঁহার সন্ন্যাস-গুরু তোতাপুরীকে কৃপা করিয়াছিলেন তাহাই এখন আলোচ্য। তোতাপুরী চল্লিশ বৎসর কঠোর তপস্যান্তে নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন। তিনি সাধারণতঃ কোথাও তিন দিনের বেশী থাকিতেন না। কিন্তু ঠাকুরের অলৌকিক আকর্ষণে দক্ষিণেশ্বরে তিনি প্রায় এগার মাস কাল অবস্থান করেন। তিনি কখনও ঘরের ভিতরে বাস করিতেন না। বৃক্ষতলই তাঁহার স্বাভাবিক বাসস্থান ছিল। তিনি পঞ্চবটীতলে আসন পাতিয়া ছিলেন এবং সর্বদা পার্শ্বে ধুনী জ্বালিয়া রাখিতেন। তাঁহার নিকট একটি লোটা (জলপাত্র) ছিল। লোটাটি তিনি নিত্য মাজিয়া ঝক্‌ঝকে রাখিতেন। তিনি সমাধিবান্ সন্ন্যাসী হইলেও নিত্য ধ্যানাভ্যাস করিতেন। ইহা দেখিয়া ঠাকুর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, "তোমার ত ব্রহ্মলাভ হয়েছে, সিদ্ধ হয়েছ। তবে কেন আবার নিত্য ধ্যানাভ্যাস কর?" তোতা ইহাতে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাতপূর্বক অঙ্গুলি-নির্দেশে লোটাটী দেখাইয়া বলিলেন, "উহা কেমন উজ্জ্বল দেখছ? কিন্তু যদি উহাকে নিত্য না মাজি, মলিন হয়ে যাবে না? মনও সেরূপ জানবে। ধ্যানাভ্যাস করে মনকেও ঐরূপ নিত্য না মেজে-ঘসে রাখলে মলিন হয়ে পড়ে।" তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর তোতাপুরীর কথা মানিয়া লইয়া বলিলেন, "যদি সোনার লোটা হয়? তাহলে ত আর নিত্য না মাজলেও ময়লা ধরে না।" তোতাপুরী হাসিয়া শিষ্যোক্তি স্বীকার করিলেন, "হাঁ, তা বটে।" তোতাপুরী বুঝিলেন, ঠাকুরের মন সোনার লোটার মত উজ্জ্বল। গুরু-শিষ্যের মধ্যে এরূপে ভাবের আদান-প্রদান প্রথম হইতেই চলিত।

জীবন্মুক্ত তোতাপুরী সম্পূর্ণ অভীঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। জগতের কোন ব্যক্তি বা বস্তু হইতে তিনি ভয় পাইতেন না। তিনি যে কত দূর নির্ভীক ছিলেন তাহা নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে প্রমাণিত হয়। যখন গভীর নিশীথে সমগ্র জগৎ বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে নিদ্রিত হইত তখন তিনি ধুনি উজ্জ্বলতর করিয়া অচল অটল সুমেরুবৎ আসনে বসিয়া নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ সুস্থির মনকে সমাধিমগ্ন করিতেন এক রাত্রে তিনি ধ্যানে বসিবার উপক্রম করিতেছেন। চতুর্দিক নীরব নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে ঝিল্লীর ও পেচকের গম্ভীর নিস্বন ব্যতীত আর কোন শব্দই শোনা যাইতেছিল না। বায়ুও নিশ্চল। সহসা পঞ্চবটীর বৃক্ষশাখাসমূহ আলোড়িত হইতে লাগিল এবং দীর্ঘকায় মানবাকৃতি এক ব্রহ্মদৈত্য বৃক্ষের উপর হইতে নিম্নে নামিয়া আসিয়া ধুনির পাশে বসিলেন। নির্ভীক তোতাপুরী নিজের ন্যায় উলঙ্গ সেই ভৈরব পুরুষ দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি?" দেবপুরুষ উত্তর দিলেন, "আমি দেবযোনি ভৈরব। এই দেবস্থান রক্ষার্থ বৃক্ষোপরি অবস্থান করি।" তোতা ইহাতে আদৌ ভীত না হইয়া উত্তর দিলেন, "উত্তম কথা। তুমিও যা, আমিও তাই। তুমিও ব্রহ্মের এক প্রকাশ, আমিও তাই। এস, বস, ব্রহ্মধ্যান কর।" ভৈরব হাসিয়া বায়ুতে যেন মিলাইয়া গেলেন। উক্ত ঘটনায় তোতাপুরী বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন। পরদিন প্রাতে তিনি ঠাকুরকে ভৈরবের কথা জানাইলেন। ঠাকুরও ইহা শুনিয়া বলিলেন, "হাঁ, উনি এখানে থাকেন বটে। আমিও উঁহার দর্শন অনেক বার পেয়েছি। কথনো কখনো কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয়ও তিনি আমাকে বলে দিয়েছেন। কোম্পানী

াকুদখানার জন্য পঞ্চবটীর স স্ত জমিটি একবার নেবার চেষ্টা করেন। মামার তাই শুনে ভীষণ ভাবনা হয়েছিল। সংসারের কোলাহল থেকে রে নির্জন স্থানটিতে বসে মাকে ডাকি, তা আর হবে না, সেজন্য। থুর তো রাণী রাসমণির তরফ থেকে কোম্পানীর সঙ্গে খুব মামলা াগিয়ে দিলে, যাতে কোম্পানী জমিটি না নেয়। সেই সময় একদিন ৈভেরব গাছে বসে আছেন দেখতে পাই। আমাকে সঙ্কেতে তিনি লেছিলেন, 'কোম্পানী জায়গা নিতে পারবে না, মামলায় হেরে াবে।' বাস্তবিকই তাই হল।"

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলেও প্রারব্ধ-প্রভাবে মানুষ সম্পূর্ণরূপে ক্রাধাদি রিপু হইতে মুক্ত হইতে পারে না। একদিন সন্ধ্যার পর াকুর তোতাপুরীর ধুনীর পাশে বসিয়া আছেন। ঈশ্বরপ্রসঙ্গে গুরু ও শিষ্য মাতোয়ারা হইয়াছেন। পার্শ্বে ধুনীর অনল ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া হানন্দে শতজিহ্বা বিস্তারপূর্বক হাসিতেছেন। এমন সময়ে বাগানের াকটি চাকর তথায় আসিয়া তামাক খাইবার জন্য নিজের কল্‌কেতে ামাক সাজিয়া ধুনীর কাঠ টানিয়া অঙ্গার লইতে লাগিল। ব্রহ্মপ্রসঙ্গে ময় তোতাপুরীর দৃষ্টি হঠাৎ সেদিকে পড়ায় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া াহাকে তিনি তিরস্কার করিলেন এবং চিম্‌টা দিয়া মারিবার ভয় দখাইলেন। ঠাকুর তোতাপুরীর কঠোর ব্যবহার দর্শনে ভাবাবিষ্ট ইয়া উচ্চ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "দূর শালা! দূর শালা!" াকুর এই কথা বার বার বলিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাতাপুরী ঠাকুরকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া বলিলেন, তুমি অমন করছ যে! লোকটার কী অন্যায় দেখ দেখি!" ঠাকুর াসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাত বটে! সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের

দৌড়টাও দেখছি! এই মুখে বলছিলে, ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তাই নে
জগতের সকল বস্তু ও ব্যক্তি ব্রহ্মেরই প্রকাশ। আর পরক্ষণেই স
কথা ভুলে মানুষকে মারতে উঠেছ। তাই হাসছি যে, মহামায়ার কি
প্রবল প্রভাব!" তোতাপুরী ইহা শুনিয়া গম্ভীরভাবে নির্বাক্ হই
রহিলেন এবং কিছুক্ষণ পরে স্বশিষ্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলে
"ঠিক বলেছ, ক্রোধে সকল কথা বাস্তবিকই ভুলে গিয়েছিলাম
ক্রোধ বড় পাজী জিনিষ! আজ থেকে ক্রোধ পরিত্যাগ করলুম
শিষ্যের পূত সংস্পর্শে জ্ঞানী গুরু তোতাপুরী ক্রোধমুক্ত হইলেন।

প্রথমে তোতাপুরী শুষ্ক বেদান্তী ছিলেন, ভক্তিমার্গে তাঁহ
উপলব্ধি ছিল না। তাঁহার নিকট ব্রহ্মই একমাত্র সত্য ও জগ
মিথ্যা বা মায়ামাত্র। তিনি ব্রহ্মশক্তি বা জগদম্বাকে মানিতেন না
ঠাকুর বাল্যাবধি করতালি দিয়া সকালে ও সন্ধ্যায় হরিনাম বা মা
নামাদি উচ্চৈঃস্বরে কিছুক্ষণ করিতেন। নির্বিকল্প সমাধি লাভের পর
তিনি এইরূপ করিতে বিরত হন নাই। এক অপরাহ্নে তোতাপুরী
নিকট বসিয়া ধর্মপ্রসঙ্গ করিতে করিতে সন্ধ্যা সমাগতা হইল। ঠাকু
তখন ধর্মালাপ বন্ধ করিয়া হাততালি দিয়া ঈশ্বরের নাম লইত
লাগিলেন। তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া তোতাপুরী অবা
হইলেন এবং প্রকাশ্যে উপহাসছলে বলিয়াই ফেলিলেন, "আরে কেঁ
রোটী ঠোক্‌তে হো!" অর্থাৎ আরে হাত চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে রো
তৈয়ার করছ নাকি! গুরুর বিদ্রূপে শিষ্য সহাস্যে বলিলেন, "দ
শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করছি, আর তুমি কি না বলছ, আমি রু
ঠুকৃছি?" গুরুও শিষ্যের সরল উক্তিতে হাসিতে লাগিলেন এ
বুঝিলেন, সমাধিবান্ শিষ্যের এই অনুষ্ঠান অর্থহীন বা অনিষ্টকর নহে

শিশুস্বভাব রামকৃষ্ণ জগন্মাতার নিকট অভিযোগ করিলেন, “মা তোতা তোমাকে মানে না। তোমার অস্তিত্ব তাহার নিকট প্রকটিত কর। ব্রহ্মজ্ঞানীর শিক্ষা সম্পূর্ণ হউক।” ঠাকুরের প্রার্থনা অচিরে পূর্ণ হইল।

তোতাপুরীর পশ্চিমী শরীর বাংলার আর্দ্র জলবায়ুতে রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িল। তিনি কঠিন রক্তামাশয় রোগে ভুগিতে লাগিলেন। দিবারাত্র পেটের ব্যথায় তাঁহার সমাধিস্থ চিত্তও শরীরের দিকে আসিয়া পড়িতে লাগিল। ঠাকুর সত্যই বলিতেন, ‘পঞ্চভূতের ফাঁদে ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।’ তোতার মন বাংলাদেশ ছাড়িবার জন্য ব্যগ্র হইল। কিন্তু শিষ্যসঙ্গে ব্রহ্মচর্চায় তিনি এত মাতিয়া থাকিতেন যে, এত কাল অন্যত্র যাইতে পারেন নাই। ক্রমে তাঁহার শরীর জীর্ণ ও দুর্বল হইয়া পড়িল। ঠাকুর তাঁহার জন্য বিশেষ পথ্য ও সামান্য ঔষধাদির ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন সুফলোদয় হইল না। রোগ বাড়িয়া চলিল এবং রোগীকে অসহ্য যন্ত্রণা দিতে লাগিল। এক রাত্রে তোতাপুরী পেটের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলেন, আর শুইয়া থাকিতে পারিলেন না। কিন্তু বসিয়া থাকাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। যে মন সহজে ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হইত এবং শরীর ভুলিয়া যাইত তাহা আজ দেহ ছাড়িয়া সমাধিভূমিতে উঠিতেই পারিল না। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ভাবিলেন, হাড়-মাংসের খাঁচার জ্বালায় মনটাও আমার আজ আয়ত্তে নেই? তিনি গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগপূর্বক সকল যন্ত্রণার অবসান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বিশেষ যত্নে মনকে ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন করিয়া গঙ্গাজলে নামিলেন এবং ক্রমে নদীর গভীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আসিলেন। আশ্চর্য্য! তোতাপুরী প্রায়

গঙ্গার পরপারে চলিয়া গেলেন, অথচ ডুব-জল পাইলেন না। অপর পারের বৃক্ষাদি ছায়ার মত দেখা যাইতে লাগিল। তখন তিনি বিস্মিত হইয়া চিন্তা করিলেন, "একি দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার জল পর্য্যন্ত আজ গঙ্গায় নাই !!" অমনি তিনি মহামায়ার দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব বুঝিতে পারিলেন। তিনি বুঝিলেন, মহামায়ার অচিন্ত্য শক্তির রাজ্য ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষও উপেক্ষা করিতে পারেন না। যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ ইচ্ছাময়ী মহামায়ার প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার সাধ্য কাহারো নাই, ব্রহ্মজ্ঞেরও স্বেচ্ছায় মরিবার সামর্থ্য নাই। তাঁহার অন্তরে এই অপূর্ব প্রত্যয় জন্মিল, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভিন্ন।

গভীর নিশীথে তোতাপুরী জগদম্বার বিরাটরূপ দর্শনে ধন্য হইলেন এবং গম্ভীর অম্বারবে চারিদিক মুখরিত করিয়া তুলিলেন। তিনি পুনরায় গঙ্গাপার হইয়া পঞ্চবটীতে ফিরিলেন। তাঁহার অন্তর সমাধি-স্মৃতির অপূর্ব উল্লাসে উল্লসিত হইল। তিনি ধুনীর ধারে বসিয়া সমস্ত রাত্রি জগদম্বার নামে ও ধ্যানে কাটাইলেন। জগদম্বার দর্শন লাভান্তে তিনি তৎকৃপায় রোগমুক্ত হইলেন। প্রভাতে শিষ্য সমীপে আসিতেই গুরু তাঁহাকে পূর্ব রাত্রির অদ্ভুত ঘটনাটী জানাইলেন। গুরুর অভিনব অনুভূতির কথা শুনিয়া শিষ্য সহাস্যে বলিলেন, "মাকে যে আগে মান্‌তে না! আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যা ঝুট বলে তর্ক করতে! এখন দেখ্‌লে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচে গেল। আমাকে তিনি পূর্বে দেখিয়েছেন, ব্রহ্মই কালী। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন তেমনি।" অনন্তর প্রভাতী সুরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল। শিব-রামের ন্যায় গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ উভয় মহাপুরুষ কালী-মন্দিরে গেলেন এবং দেবী-মূর্তির

সম্মুখে প্রণত হইলেন। উভয়েই প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, জগদম্বা তোতাকে এবার এখান হইতে যাইবার জন্য প্রসন্ন মনে অনুমতি দিলেন। ইহার কয়েক দিবস পরেই তোতাপুরী ঠাকুরের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া কালীবাড়ী পরিত্যাগপূর্বক পশ্চিমে যাত্রা করিলেন। উক্ত শিক্ষা দানের জন্যই জগদম্বা তাঁহাকে শিষ্য-সঙ্গে এত কাল আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। তোতাপুরী এদিকে আর কখনো ফিরিয়া আসেন নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বৈষ্ণব সাধন

তান্ত্রিক সাধনসমূহে সিদ্ধিলাভের পর ঠাকুর বৈষ্ণব সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাব সাধন করিয়া তিনি সম্যক্ সিদ্ধ হন। মহাবীরের পদানুগ হইয়া তিনি কিরূপে দাস্যভক্তি সাধনে সিদ্ধিলাভ করেন তাহাই প্রথমে আলোচ্য। জগন্মাতার দর্শনলাভের পর তাঁহার চিত্ত স্বীয় কুলদেবতা রঘুবীরের দিকে আকৃষ্ট হয়। মহাবীরের ন্যায় অনন্য ভক্তিতেই ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভ সম্ভবপর বুঝিয়া তিনি দাস্যভাবে সিদ্ধ হইবার জন্য এখন আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ করিয়া কিছু কাল সাধনা করেন। নিরন্তর রামভক্ত মহাবীরের অনুধ্যানের ফলে তিনি উক্ত ভাবে এত দূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে, স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব একেবারে বিস্মৃত হন। তখন আহার-বিহারাদি সকল কার্য তিনি

হনুমানের ন্যায় করিতেন। তিনি যে এইরূপ ইচ্ছাপূর্বক করিতে
তাহা নহে, তল্লীনতার ফলে স্বতঃই তাঁহার আচরণ এইরূপ হইত
তিনি পরিধেয় বস্ত্রখানি লেজের মত করিয়া কোমরে জড়াইয়
বাঁধিতেন, উল্লম্ফনে চলিতেন, ফলমূলাদি ভিন্ন অন্য কিছুই খাইতেন না
আবার ফলমুলাদি খোসা ফেলিয়া খাইতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না
তিনি খোসা শুদ্ধই খাইতেন। বৃক্ষের উপরই অধিকাংশ সময় তি
কাটাইতেন এবং 'রঘুবীর', 'রঘুবীর' বলিয়া গম্ভীর স্বরে চীৎকা
করিতেন! তখন তাঁহার চক্ষুদ্বয় সর্বদা চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল
নিরন্তর মহাবীরেব অনুধ্যানের ফলে তাঁহার দৈহিক পরিবর্তন
ঘটিয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁহার মেরুদণ্ডের শেষভাগটা উ
কালে প্রায় এক ইঞ্চি পরিমাণ বাড়িয়া গিয়াছিল। ভাবাতিশয়ে
মেরুদণ্ডের বৃদ্ধি (enlargement of the coccyx) প্রভৃ
শারীরিক বিকার ধর্মেতিহাসে বিস্ময়কর ও অতি বিরল।

ঠাকুরের মুখে মেরুদণ্ডের বৃদ্ধির কথা শুনিয়া শিষ্যগণ তাঁহা
পরবর্তীকালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয়, আপনার শরীরে
উক্ত অংশ কি এখনো ঐরূপ আছে?" ইহাতে ঠাকুর উত্তর দিয়
ছিলেন, "না, মনের উপর হইতে উক্ত ভাবের প্রভুত্ব চলিয়া যাইবা
পরে কালে উহা ধীরে ধীরে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক আকার ধার
করিয়াছে।" দাস্যভক্তি সাধনকালে ঠাকুর যে দিব্য দর্শন
অলৌকিক অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন তাহা অভূতপূর্ব। উহা তাঁহ
মানসপটে গভীর ভাবে অঙ্কিত হইয়া স্মৃতিতে সর্বক্ষণ জাগরুক ছিল
তিনি বলিতেন, "এই কালে পঞ্চবটীতলে একদিন বসিয়া আ
ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহা নয়, অমনি বসিয়াছিলাম

এমন সময় এক নিরুপমা জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীমূর্তি অদূরে আবির্ভূতা হইয়া স্থানটীকে আলোকিত করিয়া তুলিল। ঐ মূর্তিটীকেই তখন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নয়, পঞ্চবটীর গাছপালা, গঙ্গা ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতেছিলাম। দেখিলাম, মূর্তিটী মানবীর্; কারণ উহা দেবীগণের ন্যায় ত্রিনয়ন-সম্পন্না নহেন। কিন্তু উহা প্রেম-দুঃখ-করুণা-সহিষ্ণুতাপূর্ণ। সেই মুখের ন্যায় অপূর্ব ওজস্বী গম্ভীর ভাব দেবীমূর্তিসমূহেও সচরাচর দেখা যায় না। সুপ্রসন্ন দৃষ্টি পাতে মোহিত করিয়া ঐ দেবী মানবী ধীর মন্থর পদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, কে ইনি? এমন সময় একটা হনুমান কোথা হইতে সহসা উ-উপ শব্দ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং ভিতর হইতে মন বলিয়া উঠিল, "সীতা, জনম-দুঃখিনী সীতা, জনক-রাজ-নন্দিনী সীতা, রামময় জীবিতা সীতা!" তখন মা, মা বলিয়া অধীর হইয়া তাঁহার পদে নিপতিত হইতে যাইতেছি এমন সময় তিনি চকিতের ন্যায় আসিয়া (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন। আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহ্য জ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলাম। ধ্যানচিন্তাদি কিছু না করিয়া এমন ভাবে কোন দর্শন ইতিপূর্বে আর হয় নাই। জনম-দুঃখিনী সীতাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছি।" একদিন তোতাপুরী কালীঘরে বসিয়া একমনে অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঠ করিতে-ছিলেন। হঠাৎ সেখানে যাইয়া ঠাকুর ভাবনেত্রে দেখিলেন, "নদী তার পাশে বন ও সবুজ গাছপালা এবং জাঙ্গিয়া-পরা রাম-লক্ষণ চলে যাচ্ছেন।"

বাৎসল্য ও মধুর ভাব সাধনের পূর্বে ঠাকুরের মধ্যে নারীভাবের বিকাশ হইয়াছিল। তিনি তখন আপনাকে জগন্মাতার সখীরূপে ভাবিয়া চামরহস্তে তাঁহাকে বীজনে নিযুক্ত হইতেন। তিনি শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় মথুরানাথের জানবাজারস্থ ভবনে যাইয়া নারীবেশে কুলস্ত্রীগণের সহিত দেবী-প্রতিমাকে দর্শন ও চামর ব্যজন করিতেন। নারীভাবের প্রাবল্যে তিনি অনেক সময় বিস্মৃত হইতেন যে, তিনি পুরুষদেহধারী। তিনি যখন যে ভাবের সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন তখন সে ভাবের সাধকগণ তথায় দলে দলে আসিতেন। তাঁহার অনুজ্ঞায় মথুরানাথ কালীবাড়ীতে সাধুসেবার যে সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহার ফলে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সাধু-ভক্তগণ তথায় আসিয়া সাধনভজন করিতেন। ১২৬৯-৭০ সালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর অসাধারণ আতিথেয়তার সুখ্যাতি সাধু-ভক্তগণের মধ্যে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি যখন বাৎসল্য ভাব সাধনে অগ্রসর হন তখন বৈরাগী বৈষ্ণবগণ তথায় দলে দলে আগমন করেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীও তখন তথায় ছিলেন। ১২৭০ সালে সিদ্ধ পুরুষ রামাইৎ বাবাজী জটাধারী তথায় আসেন। জটাধারী ভারতের নানা তীর্থ যদৃচ্ছা ভ্রমণপূর্বক দৈব্য প্রেরণায় দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন।

ঠাকুর বলিতেন, "তখন আসতে লাগল যত রামাইৎ বাবাজী, ভাল ভাল ত্যাগী ভক্ত বৈরাগী বাবাজী। তারা সব দলে দলে আসতে লাগল। আহা! তাদের কি ভক্তি-বিশ্বাস! কি সেবা-নিষ্ঠা! তাদের এক জনের নিকট থেকেই তো 'রামলালা' আমার কাছে থেকে গেল।" জটাধারীর নিকট হইতেই ঠাকুর উক্ত অষ্টধাতুময় রামমূর্তি প্রাপ্ত হন। 'রামলালা' শব্দের অর্থ বালকবেশী রামচন্দ্র। উত্তর-

পশ্চিম ভারতে লোকে বালকবালিকাগণকে আদর করিয়া 'লালা' ও 'লালী বলিয়া ডাকে। সেইজন্য জটাধারী বাবাজী শ্রীরামচন্দ্রের বালক-বিগ্রহকে 'রামলালা' বলিয়া ডাকিতেন। জটাধারী রামলালাকে চিরকাল সেবা করিতেন এবং সর্বদা সঙ্গে রাখিতেন। তিনি যেখানে যাইতেন রামলালাকে সঙ্গে লইতেন। যাহা ভিক্ষায় পাইতেন তাহা রাঁধিয়া রামলালাকে ভোগ দিতেন। আবার তিনি যাহা নিবেদন করিতেন, তাহা রামলালা সত্য সত্যই খাইতেন! বালকবেশী ভগবান্ রামচন্দ্র তাঁহার নিকট খাবার জিনিস চাহিতেন, আবদার করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে যাইতেন। জটাধারী সারাদিন রামলালাকে লইয়া আনন্দে বিভোর হইয়া থাকিতেন। শুধু জটাধারী নহেন, ঠাকুরও রামলালার উক্ত দিব্য লীলা দেখিতে পাইতেন। ঠাকুর জটাধারীর কাছে চব্বিশ ঘণ্টা বসিয়া থাকিয়া রামলালাকে দেখিতেন।

সিদ্ধপুরুষ জটাধারীর নিকট গোপালমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বাৎসল্য-সিদ্ধ হইবার জন্য ঠাকুর ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং গুরুদত্ত সাধনায় নিমগ্ন হইয়া কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপাল মূর্তির অনুক্ষণ দিব্যদর্শনলাভে সমর্থ হইলেন। বাৎসল্যভাবে সিদ্ধ হইয়া তিনি উক্ত দিব্য-মুর্তি অনুধ্যানে অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন—

যো রাম দশরথ কি বেটা
ওহি রাম ঘট-ঘট্‌মে লেটা।
ওহি রাম জগত পসেরা
ওহি রাম সব্‌সে নেয়ারা॥

উপরোক্ত হিন্দী দোঁহাটি ঠাকুর অনেক সময় আবৃত্তি করিতেন ঠাকুর দেখিলেন, যে রাম দশরথের পুত্র, তিনিই আত্মারূপে

সর্বপ্রাণীতে বিরাজমান। তিনিই ব্রহ্মরূপে জগদ্ব্যাপী ও সর্বাপেক্ষা সুন্দর।

ক্রমে রামলালা ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। যতক্ষণ ঠাকুর জটাধারীর কাছে বসিতেন, ততক্ষণ রামলালা সেখানে থাকিতেন ও খেলাধূলা করিতেন। আবার যেই ঠাকুর সেখান হইতে নিজের ঘরে আসিতেন, তখন রামলালাও তাঁহার সঙ্গ লইতেন। ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে আসিতে বারণ করিলেও রামলালা সাধুর কাছে থাকিতেন না। পরবর্তী কালে ঠাকুর তাঁহার শিষ্যগণকে বলিতেন, "দেখতুম, সত্য সত্য দেখতুম, রামলালা আমার সঙ্গে সঙ্গে কখন আগে কখন পিছনে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আসছে। কখন বা আমার কোলে উঠবার জন্য আবদার করছে। আবার হয়ত কখন বা কোলে করে রয়েছি, কিছুতেই কোলে থাকবে না। কোল থেকে নেমে রোদে দৌড়াদৌড়ি করতে যাবে, কাঁটাবনে গিয়ে ফুল তুলবে, বা গঙ্গার জলে নেমে ঝাঁপাই জুড়বে।" ঠাকুর রামলালাকে এরূপ করিতে নিষেধপূর্বক বলিতেন, "ওরে অমন করিস্ নি, গরমে পায়ে ফোস্কা পড়বে, ওরে জল ঘাঁটিস্‌নি, ঠাণ্ডা লেগে সর্দি হবে, জ্বর হবে।"

কিন্তু রামলালা ঠাকুরের কথায় কর্ণপাত করিতেন না। তিনি তাঁহার পদ্মপলাশতুল্য সুন্দর নয়নযুগল ঠাকুরের দিকে ফিরাইয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেন, কখন বা আরো দুরন্তপনা করিতেন। কখন বা ঠোঁট দুটি ফুলাইয়া মুখভঙ্গী করিতেন। তখন ঠাকুর সত্য সত্যই ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতেন, "তবে রে পাজী, রোস্। আজ তোকে মেরে হাড় গুঁড়ো করে দেব।" এই বলিয়া ঠাকুর জোর করিয়া রামলালাকে রৌদ্র বা জল হইতে টানিয়া আনিতেন এবং নানা ভাবে ভুলাইয়া

ঘরের ভিতর খেলিতে দিতেন। যেদিন রামলালার দুষ্টামী কিছুতেই থামিত না, সেদিন ঠাকুর তাঁহাকে চড়-চাপড়টা মারিয়াই বসিতেন। ঠাকুর বলিতেন, "মার খেয়ে সুন্দর ঠোঁট দুইখানি ফুলিয়ে সজল নয়নে সে আমার দিকে তাকিয়ে দেখত। তখন আমার মনে কষ্ট হত। কোলে নিয়ে কত আদর করে তাকে ভোলাতাম। এরকম সব ঠিক ঠিক দেখতুম, করতুম।"

একদিন ঠাকুর গঙ্গায় স্নান করিতে যাইতেছিলেন। তখন রামলালা বায়না ধরিলেন যে, তিনিও নাইতে যাইবেন। ঠাকুর বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। কিন্তু রামলালা গঙ্গায় নামিয়া জল হইতে আর উঠিতে চাহিলেন না, জলক্রীড়ায় প্রমত্ত রহিলেন। জল হইতে উঠিয়া আসিবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে বারবার বলিলেন। কিন্তু তিনি সে সব কথা আদৌ শুনিলেন না। তখন ঠাকুর ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে জলে চুবাইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তবে নে, কত জল ঘাঁটতে চাস্ ঘাঁট।" বালগোপাল রামলালা জলের ভিতর হাঁপাইয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার কষ্ট দেখিয়া ঠাকুর মর্মাহত হইলেন এবং তাঁহাকে কোলে করিয়া জল হইতে উঠাইলেন। আর একদিন রামলালা নানা আবদার করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য ঠাকুর কয়েকটি ধানশুদ্ধ খই খাইতে দিলেন। সেই খই খাইতে খাইতে ধানের তুষ লাগিয়া রামলালার নরম জিভ্ চিরিয়া গেল। ইহা দেখিয়া ঠাকুর এত কষ্ট পাইলেন যে, তিনি রামলালাকে কোলে লইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মুখটি ধরিয়া সস্নেহে বলিলেন, "যে মুখে মা কৌশল্যা লাগবে বলে ক্ষীর সর ননীও অতি সন্তর্পণে তুলিয়া দিতেন, আমি এত হতভাগা যে, সেই

মুখে এই কদর্য খাবার দিতে আমার মনে একটুও সঙ্কোচ হল না।"

পরবর্তী কালে ঠাকুর যখন এই ঘটনা ভক্তদের নিকট বলিতেন তখনো তিনি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিতেন না এবং তাঁহার শ্রোতৃবর্গের চক্ষেও জল আসিত। ঠাকুরের সহিত রামলালার এই লীলাখেলা কি অদ্ভুত তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না।

এক এক দিন জটাধারী অন্ন-ব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া ভোগ দিতে বসিয়া রামলালাকে দেখিতেই পাইতেন না। তখন মনে ব্যথা পাইয়া ঠাকুরের ঘরে ছুটিয়া আসিতেন এবং দেখিতেন, রামলালা তথায় খেলা করিতেছেন। তখন তিনি অভিমানে তাঁহাকে বলিতেন, "আমি এত করে রেঁধে বেড়ে তোকে খাওয়াব বলে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুই কিনা এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে ভুলে রয়েছিস্! তোর ধারাই ঐরূপ! যা ইচ্ছা হয় তাই করবি। মায়া দয়া তোর কিছুই নাই। বাপ মাকে ছেড়ে বনে গেলি, বাপটা কেঁদে কেঁদে মরে গেল, তবুও ফিরলি না, তাকে দেখা দিলি না!" এইরূপ নানা কথা বলিয়া তিনি রামলালাকে টানিয়া লইয়া গিয়া খাওয়াইতেন। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। রামলালা ঠাকুরকে ছাড়িয়া যাইতে চাহেন না বলিয়া জটাধারী কালীবাড়ীতে দীর্ঘকাল রহিলেন। একদিন জটাধারী হঠাৎ আসিয়া ঠাকুরকে সজল নয়নে বলিলেন, "রামলালা আমাকে কৃপা করে প্রাণের পিপাসামিটিয়ে যেমন ভাবে দেখতে চাইতাম তেমন ভাবে দর্শন দিয়েছে ও বলছে, এখান থেকে সে যাবে না! তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই সে যেতে চায় না। আমার এখন আর মনে কোন দুঃখকষ্ট নাই। তোমার কাছে ও সুখে থাকে, আনন্দে খেলাধুলা করে। তাই দেখেই আমি

আনন্দে ভরপূর হয়ে যাই! এখন আমার এমনটা হয়েছে যে, ওর যাতে সুখ তাতেই আমার সুখ। সেজন্য আমি এখন একে তোমার কাছে রেখে অন্যত্র যেতে পারব। তোমার কাছে সুখে সে আছে ভেবে ধ্যান করেই আমার আনন্দ হবে।” এই বলিয়া প্রাণপ্রিয় ইষ্টদেব রামলালাকে ঠাকুরের হস্তে সমর্পণপূর্বক কালীবাড়ী হইতে জটাধারী চিরবিদায় লইলেন। সেই অবধি রামলালা ঠাকুরের কাছে রহিয়া গেলেন। উক্ত বিগ্রহ দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে এখনও সযত্নে রক্ষিত আছে।

এইবার আমরা ঠাকুরের মধুর ভাব সাধনের অলৌকিক ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিব। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, বাৎসল্যভাব সাধনের পূর্বে ঠাকুরের মনে নারীভাবের উদয় হইয়াছিল। মধুর ভাব সাধন কালে ঠাকুরের মধ্যে স্ত্রীভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ দৃষ্ট হয়। তিনি এখন হইতে নারীবেশ পরিধানে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রামকৃষ্ণগত-প্রাণ মহাভাগ্যবান্ মথুরানাথ তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাঁহার জন্য বহুমূল্য বারাণসী সাড়ী এবং ঘাগ্‌রা, ওড়না, কাঁচুলী প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন। তিনি ‘বাবা’র নারীবেশ সর্বাঙ্গ-সুন্দর করিবার জন্য চাঁচর কেশপাশ (পরচুলা) এবং একসুট স্বর্ণা-লঙ্কারও আনাইয়া ছিলেন। ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া ব্রজরমণীর ভাবে ক্রমে এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার পুরুষ-বোধ এককালে তিরোহিত হইয়া গেল। প্রত্যেক চিন্তায় বাক্যে ও কার্যে তিনি নারীসুলভ আচরণ করিতেন। তিনি মধুর ভাব সাধন কালে সুদীর্ঘ ছয়মাস নারীবেশ ধারণপূর্বক অবস্থান করিয়া-ছিলেন। রমণীবেশ ধারণ করিলে তাঁহাকে সহসা চিনিয়া ফেলা

পরিচিত আত্মীয়গণের পক্ষেও দুঃসাধ্য হইত। মথুরানাথের জান-বাজারস্থ বাটীতে রমণীগণের মধ্যে ঠাকুর একদিন রমণীবেশে সুসজ্জিত ছিলেন। মথুরানাথ হৃদয়রামকে অন্তঃপুরে লইয়া যাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি উহাদের মধ্যে তোমার মামা কোনটি ?" এতকাল এক সঙ্গে বাস ও নিত্য সেবাদি করিয়াও হৃদয়রাম তাঁহাকে রমণীগণের মধ্যে সহসা চিনিতে পারেন নাই। দক্ষিণেশ্বর কালী-বাড়ীতে ঠাকুর প্রত্যহ প্রত্যুষে হাতে সাজি লইয়া বাগানে ফুল তুলিতেন। তখন অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন, চলিবার সময় রমণীর ন্যায় প্রতিবার তাঁহার বাম পদ স্বতঃই অগ্রসর হইত। ভৈরবী ব্রাহ্মণী বলিতেন, "ঐরূপে পুষ্পচয়ন করিবার কালে ঠাকুরকে দেখিয়া আমার সময় সময় সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে।" ফুল তুলিয়া ঠাকুর বিচিত্র মালা গাঁথিয়া প্রতিদিন রাধাগোবিন্দজীকে সাজাইতেন। কখনো কখনো তিনি জগদম্বাকে পুষ্পমাল্যে সাজাইয়া কাত্যায়নীর নিকট ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য সকরুণ প্রার্থনা করিতেন। দিন, পক্ষ, মাসান্তেও অবিশ্বাস বা নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিত না। ক্রমশঃ সেই প্রার্থনা ক্রন্দন, উৎকণ্ঠা ও চাঞ্চল্যে পরিণত হইল। আকুলতার আতিশয্যে তাঁহার ক্ষুধা-নিদ্রাদি লোপ পাইল। অত্যধিক ব্যাকুলতা বিরহের আকার ধারণ করিল। এই বিরহ শুধু মানসিক বিকাররূপে প্রকাশিত হয় নাই ; কিন্তু উহা নিদারুণ দৈহিক উত্তাপ ও জ্বালারূপে পুনরায় আবির্ভূত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিরহা-নলে ঠাকুরের দেহের লোমকূপ হইতে সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্ত নির্গত হইত, তাঁহার দেহগ্রন্থিসমূহ ভগ্ন ও শিথিল দেখা যাইত।

অসহ্য অন্তর্দাহে ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য হইতে এককালে বিরত হওয়ায় তাঁহার দেহ কখনো কখনো মৃতবৎ নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত।

শ্রীরাধার কৃপাবলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন সম্ভব জানিয়া ঠাকুর এখন হইতে মহাভাবময়ী রাধারাণীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাঁহার প্রেমঘন মূর্তির নিরন্তর ধ্যানে মগ্ন রহিলেন। ইহার ফলে তিনি অচিরেই শ্রীমতী রাধিকার দর্শনলাভ করিলেন। অন্যান্য দেবদেবীর দর্শনকালে তিনি ইতোপূর্বে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তদ্রূপ উক্ত দর্শন-সময়েও দৃষ্ট মূর্তি নিজাঙ্গে মিলিত হইয়া গেল! ঠাকুর বলিতেন, "শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে সর্বস্বহারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্তির মহিমা ও বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশর পুষ্পের কেশর সকলের ন্যায় গৌরবর্ণ দেখিয়াছিলাম।" শ্রীরাধার দর্শনলাভের পর হইতে ঠাকুর কিছু কাল নিরন্তর নিজেকে শ্রীমতী বলিয়া উপলব্ধি করিতেন। শ্রীরাধার শ্রীমূর্তি ও অতীন্দ্রিয় কৃষ্ণপ্রেমের সুগভীর অনুধ্যানে তিনি স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্ব বোধ হারাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় তাঁহাতেও মধুর ভাবের পরাকাষ্ঠা মহাভাবের লক্ষণসমূহ প্রকটিত হইল। ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও বৈষ্ণবচরণাদি সিদ্ধ সাধকগণ তাঁহার দেহে মহাভাব সম্যক্ প্রকটিত দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ঠাকুর পরবর্তী কালে স্বশিষ্যগণকে বহুবার বলিয়াছিলেন, "উনিশ প্রকার ভাব একাধারে প্রকাশিত হইলে তাহাকে মহাভাব বলে। একথা ভক্তি-শাস্ত্রে আছে। সাধন করিয়া এক একটা ভাবে সিদ্ধ হইতেই লোকের জীবন কাটিয়া যায়। (নিজ শরীর দেখাইয়া) এখানে একাধারে একত্র ঐ প্রকার উনিশটী ভাবের পূর্ণ প্রকাশ!"

গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাভাবের নিম্নোক্ত সংজ্ঞা দিয়াছেন।—"কৃষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢ়ো মহাভাবঃ। কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্ত-বৃশ্চিক-সর্পাদিদংশকৃত দুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি, এবম্ভূতে কৃষ্ণ-সংযোগ-বিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতঃ সঃ অধিরূঢ়ঃ মহাভাবঃ।" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সুখে কষ্টের আশঙ্কায় মুহূর্তের জন্যও যে অসহিষ্ণুতাদি হয় তাহাই মহাভাব। কৃষ্ণমিলনে যে আনন্দ জন্মে তাহার লেশমাত্রও কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সুখের সমান নহে এবং কৃষ্ণ-বিরহে যে দুঃখ হয় তাহা সমস্ত বৃশ্চিক ও সর্পাদির দংশন-জাত যন্ত্রণারও অধিক। কৃষ্ণ-প্রেমের এইরূপ চরম উৎকর্ষকে মহাভাব বলে। মহাভাব প্রাপ্ত হইলে স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ ও অশ্রু প্রলয়াদি অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার চিত্ত ও তনুকে বিক্ষুব্ধ করে। ঠাকুর স্বশিষ্যগণকে বলিতেন, "তোরা বৃন্দাবন লীলার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টান্‌টাই শুধু দেখ্‌না। ধর্‌না, ঈশ্বরে মনের ঐরূপ টান হইলে তবে তাঁহাকে পাওয়া যায়। দেখ দেখি, গোপীরা স্বামীপুত্র কুলশীল মান অপমান লজ্জা ঘৃণা লোকভয় সমাজভয় সব ছাড়িয়া শ্রীগোবিন্দের জন্য কত দূর উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিলেন। এইরূপ করিতে পারিলে তবে ভগবান্ লাভ হয়।" আবার তিনি বলিতেন, "কামগন্ধহীন না হইলে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বোঝা যায় না। সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেই গোপীদের মনে কোটী রমণসুখেরও অধিক আনন্দ উপস্থিত হইয়া দেহবুদ্ধির লোপ হইত। তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাহাদের মনে উদয় হইতে পারে রে! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের দিব্য

জ্যোতিঃ তাঁহাদের শরীরকে স্পর্শ করিয়া প্রতিরোমকূপে যে তাহাদের রমণ-সুখের অধিক আনন্দ অনুভব করাইত !”

প্রকৃতিভাবে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে ঠাকুরের দেহে অদ্ভুত পরিবর্তন সংঘটিত হইয়াছিল। তিনি উক্ত ভাবে এত তন্ময় হইয়াছিলেন যে, স্বপ্নে বা ভ্রমেও কখন নিজেকে পুরুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না এবং নারীদেহের কার্য্যকলাপে তাঁহার দেহেন্দ্রিয় স্বতঃই প্রবৃত্ত হইত। স্বাধিষ্ঠান চক্রের অবস্থান-প্রদেশের রোম-কূপসমূহ হইতে তখন প্রত্যেক মাসে নিয়মিত সময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত-নির্গমন ঘটিত এবং স্ত্রীদেহের ন্যায় প্রতিবারই উপর্য্যুপরি তিন দিন ঐরূপ হইত, তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়রাম স্বচক্ষে ইহা দেখিয়াছেন। পরিহিত বস্ত্র রক্তদুষ্ট হইবার ভয়ে ঠাকুর তখন কৌপিন ব্যবহার করিতেন। মনোভাবের প্রাবল্যে তাঁহার উক্তরূপ দৈহিক পরিবর্তন হইত। এই সব দেখিয়া পদ্মলোচনাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, “আপনার উপলব্ধিসমূহ বেদপুরাণকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে।”

ব্রজেশ্বরী রাধারাণীর দর্শনলাভের স্বল্প কাল পরেই ঠাকুর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভে ধন্য হন। দৃষ্ট মূর্তি পূর্ববৎ তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। উক্ত দর্শন লাভের দুই তিন মাস পরেই পরমহংস তোতাপুরী তাঁহাকে বেদান্তোক্ত অদ্বৈত ভাব সাধনে নিযুক্ত করেন। মধুর ভাব সাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর কিছু কাল উক্ত ভাব সহায়ে ঈশ্বর-সম্ভোগে ব্যাপৃত ছিলেন। তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চিন্তায় এত তন্ময় থাকিতেন যে, স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্ব-বোধ একেবারে বিস্মৃত হইতেন এবং সর্বদা নিজেকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া

অনুভব করিতেন। আব্রহ্মস্তম্ব সর্বভূতে তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিব্য দর্শন পাইতেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দশম স্কন্ধের গোপীগীতায় বর্ণিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে গোপিগণের উক্ত অদ্বৈত অবস্থা লাভ হইয়াছিল। মধ্যযুগের মীরাবাই এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর মধ্যেও এইরূপ দিব্যভাব প্রকটিত দেখা যায়। উক্ত দর্শন লাভের বহু বর্ষ পরে যখন ঠাকুরের কাছে তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ আসেন ঠাকুর তাঁহাদের নিকট তদ্দৃষ্ট কৃষ্ণ-মূর্তির বর্ণনা করিতেন। একদিন তিনি একটী ঘাসফুল আনিয়া প্রফুল্ল বদনে শিষ্যবর্গের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তখন তখন (মধুর ভাব সাধন কালে) যে কৃষ্ণ-মূর্তি দেখিতাম তাঁহার শ্রীঅঙ্গেরও এই রকম রং ছিল।" একদিন ঠাকুর কুটীর সম্মুখে ভাবনেত্রে অর্জুনের রথ দেখিয়াছিলেন। সেই রথে সারথির বেশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট ছিলেন।

মধুর ভাবে অবস্থান কালে ঠাকুর আর একটী অপূর্ব দর্শন লাভ করেন। উক্ত কালে বিষ্ণুমন্দিরের দালানে বসিয়া তিনি একদিন শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ শুনিতেছিলেন। ভাগবত পাঠ শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া তিনি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তির সন্দর্শন লাভ করেন। উক্ত দর্শনকালে তিনি দেখিলেন, দৃষ্ট মূর্তির পাদপদ্ম হইতে দড়ার মত একটা জ্যোতিঃ বহির্গত হইয়া প্রথমে ভাগবত গ্রন্থকে স্পর্শ করিল এবং পরে তাঁহার বক্ষস্থলে সংলগ্ন হইয়া ভাগবত, ভক্ত ভগবান্—এই তিন বস্তুকে একত্রে কিছু কাল সংযুক্ত রাখিল। ঠাকুর বলিতেন, "ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান তিন এক, এক তিন।" অর্থাৎ এই তিন পদার্থ একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। ঠাকুর আরো বলিতেন, ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা। সেইজন্য ভক্ত

ভগবান্‌তুল্য পূজার্হ। ভাগবতে ভগদ্বাক্য লিপিবদ্ধ বলিয়া উহা ভগবানের বাণীমূর্তি। তদ্ধেতু পাঞ্জাবের শিখগণ গ্রন্থসাহেবকে এবং আসামের শঙ্করদেবের ভক্তগণ ভাগবতকেই পূজা করেন এবং ঈশ্বরের অন্য মূর্তি স্বীকার করেন না।

সপ্তম অধ্যায়

বেদান্ত সাধন

ভক্তিমার্গের সকল সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর বেদান্ত সাধনে অগ্রসর হইলেন। সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাল নিরন্তর ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন থাকার ফলে তিনি সর্বদা জগন্মাতার অস্তিত্ব অনুভব করিতেন এবং তাঁহার মধুর বাণী শুনিতে পাইতেন। সমুদ্রের তীরে বাস করিলে স্বতঃই লোকের মনের ইচ্ছা জন্মে, রত্নাকরের গর্ভে স্থিত রত্নরাজি দর্শন করিবার। ঠাকুর মধুর ভাব সাধনে সিদ্ধ হইয়া ভাবরাজ্যের চরম সোপানে উপনীত হইলেও ভাবাতীত নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মধাম দর্শনার্থ আকুল হইলেন। সাধন মার্গে তাঁহার যখন যে গুরুর প্রয়োজন হইত তখন দৈব প্রেরণায় তিনি স্বতঃই আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তাই তিনি যখন বেদান্ত সাধনের জন্য প্রস্তুত হইলেন তখন ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী তথায় আগমন করেন। তোতাপুরী নর্মদা নদী তীরে দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করিয়া নির্বিকল্প সমাধিতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। সাগরসঙ্গমে অবগাহন ও পুরীতীর্থ দর্শন মানসে তিনি মধ্যভারত হইতে

যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে বাংলায় উপস্থিত হন। সম্ভবতঃ ১২৭১ সালের শেষ ভাগে (১৮৬৭ খ্রীঃ) তিনি দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করেন। তিন দিনের অধিক তিনি কোন স্থানে সাধারণতঃ থাকিতেন না। কিন্তু কালীবাড়ীতে স্বশিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে তিনি প্রায় এগার মাস কাল অতিবাহিত করেন।

দিগম্বর তোতাপুরী কালীবাড়ীতে আসিয়া প্রথমেই গঙ্গাঘাটের সুবৃহৎ চাঁদনীতে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন। ঠাকুর তখন তথায় অন্যমনস্ক হইয়া একটি ধাপে বসিয়াছিলেন। তাঁহার তপোদ্দীপ্ত ভাবোজ্জ্বল মুখমণ্ডল দেখিয়া তোতাপুরী অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে বুঝিলেন, বেদান্ত সাধনের এইরূপ উত্তম অধিকারী জগতে বিরল। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে। তুমি বেদান্ত সাধন করিবে ?" জটাধারী দীর্ঘকায় নগ্নদেহ কৌপীন-পরিহিত নবাগত সন্ন্যাসীর প্রশ্নে ঠাকুর শিশুবৎ সরল ভাবে উত্তর দিলেন, "কি করিব না করিব আমি কিছুই জানি না; আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব।" তোতাপুরী তখন তাঁহাকে বলিলেন, "তবে যাও, তোমার মার কাছে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। কারণ আমি দীর্ঘকাল এখানে থাকিব না।"

পরমহংস তোতাপুরীর নির্দেশে ঠাকুর কালীমন্দিরে যাইয়া ভাবাবিষ্ট চিত্তে জগন্মাতাকে অন্তরের কথা জানাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুমতি পাইলেন। তিনি হৃষ্টমনে তোতাপুরীর নিকট আসিয়া জগন্মাতার প্রত্যাদেশ নিবেদন করিলেন। তোতাপুরী ঠাকুরকে সন্ন্যাস দিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন ঠাকুরের জননী শোক

সন্তপ্তা বৃদ্ধা চন্দ্রামণি নহবতে বাস করিতেছিলেন। জননীর প্রাণে পাছে বিষম আঘাত লাগে সেইজন্য ঠাকুর গুপ্তভাবে বৈদিক সন্ন্যাস লইতে ইচ্ছা করিলেন। ঠাকুরের সন্ন্যাস গ্রহণের শুভদিন নির্ধারিত হইল। পূর্বদিনে পিতৃপুরুষগণকে পিণ্ডদান ও আত্মশ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইল। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে ব্রহ্মচারীকে স্বীয় প্রেতপিণ্ড ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট জমা দিতে হয়। এইরূপ শাস্ত্রের বিধি আবহমান কাল হইতে ভারতে প্রচলিত আছে। পঞ্চবটীস্থ সাধন কুটীরে বিরজা হোমের আয়োজন হইল। শুভ ব্রাহ্ম মুহূর্তে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে বেদমন্ত্রের সুগম্ভীর পূতধ্বনিতে পঞ্চবটী উপবন মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই দিব্য নাদ ভাগীরথীর পুণ্য বারি কম্পিত করিয়া নবযুগের আগমনী গাহিল। পবিত্র হোমাগ্নিতে শিখা-সূত্রাদি আহুতি দিয়া গদাধর গুরুদত্ত কৌপীন ও কাষায় পরিধান করিলেন। তোতাপুরী সন্ন্যাস দীক্ষাদান কালে শিষ্যকে শ্রীরামকৃষ্ণ নামে অভিহিত করিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ তোতা শিষ্যকে অদ্বৈত বেদান্তোক্ত 'নেতি' 'নেতি' উপায় অবলম্বনে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মধ্যানে সমাহিত হইতে উপদেশ দিয়া বলিলেন, "নামরূপের সুদৃঢ় পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভগ্ন করিয়া নির্বিকল্প আত্মধ্যানে নিমগ্ন হও।" কিন্তু ঠাকুর যখন নির্বিকল্প আত্মধ্যানে ডুবিতে চেষ্টা করিলেন তখন চিদ্‌ঘন কালীমূর্তি তাঁহার চিত্তাকাশে সমুদিত হইল। তিনি সমাধিতে নিমগ্ন হইতে অক্ষম হইয়া তোতাপুরীকে জানাইলেন। ন্যাংটা তোতা তখন অতিশয় উত্তেজিত হইয়া ঠাকুরকে তীব্র তিরস্কারপূর্বক বলিলেন, "কেঁউ হোগা নেহি?" এই বলিয়া তিনি কুটীরের মধ্যে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন কাচ খণ্ড দেখিতে পাইলেন এবং উহা হাতে লইয়া উহার সূচীবৎ সুতীক্ষ্ণ অগ্রভাগ

ঠাকুরকে ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিলেন, "এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন।" গুরুর আদেশে শিষ্য পুনরায় সুদৃঢ় সংকল্প লইয়া ধ্যানে বসিলেন এবং কালীমূর্তি মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানখড়্গে উহাকে দ্বিখণ্ডিত করিলেন। তখন তাঁহার শুদ্ধ মন নামরূপের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া হু হু করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হইল। শিষ্য নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হইলে গুরু অনেকক্ষণ তথায় বসিয়া রহিলেন। পরে নিঃশব্দে সাধন কুটীরের বাহিরে আসিয়া উহার দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন, পাছে কেহ কুটীরে ঢুকিয়া শিষ্যের সমাধি ভঙ্গ করে। অনন্তর তিনি উক্ত কুটীরের অনতিদূরে নিজ আসনে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন কখন শিষ্য দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিবেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া গেল; কিন্তু শিষ্যের আহ্বান আসিল না। সপ্তম নিষাদ স্বরে যেমন কণ্ঠ বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না তেমনি সাধারণ সাধকের মন নির্বিকল্প সমাধিতে অধিক সময় অবস্থানে অসমর্থ শুষ্ক পত্র যেমন বৃক্ষ হইতে ঝরিয়া পড়ে তেমনি সমাধিলাভের একুশ দিন পরে সাধারণ সাধকের দেহত্যাগ হয়। কিন্তু ঠাকুরের শুদ্ধ চিত্ত নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপবৎ তিন দিন সমাধিস্থ ও ব্রহ্মলীন রহিল। ইহা দেখিয়া তোতাপুরী স্তম্ভিত হৃদয়ে ভাবিলেন, "চল্লিশ বৎসর কঠোর সাধনার দ্বারা যে উচ্চাবস্থা উপলব্ধি করিয়াছি তাহা এই মহাপুরুষ একদিনে আয়ত্ত করিলেন!" তিনি শিষ্যদেহে নির্বিকল্প সমাধির লক্ষণসমূহ প্রকটিত দেখিলেন—হৃদয় নিস্পন্দ, নাড়ী নিশ্চল, নাসিকাদ্বার বায়ুশূন্য। সমাধিস্থ শিষ্য কাষ্ঠখণ্ডবৎ অচলভাবে অবস্থিত। তোতাপুরী বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যে

ক্যা দৈবী মায়া ?" অনন্তর তিনি শিষ্যকে সমাধি হইতে ব্যুত্থিত করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। তাঁহার মুখনিঃসৃত 'হরি ওঁ' মন্ত্রের গম্ভীর আরাবে পঞ্চবটীর জল-স্থল-ব্যোম প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। ঠাকুর নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইবার পর স্বীয় কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। এখন হইতে নিরন্তর ছয় মাস নির্ব্বিকল্প অদ্বৈত ভূমিতে তাঁহার মন আরূঢ় রহিল। উক্ত কালে তাঁহার দেহজ্ঞান অতি অল্পই ছিল। জনৈক অপরিচিত সাধু তখন কালীবাড়ীতে থাকিয়া জোর করিয়া তাঁহাকে সামান্য আহার্য্য ও পানীয় খাওয়াইতেন। ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের স্মরণ বা তৎকথা শ্রবণ মাত্রই তাঁহার মন সমাধিলীন হইত। তখন বেদান্তবাদী সাধকাগ্রণী পরমহংসগণের সমাগম কালীবাড়ীতে হইয়াছিল। তাঁহারা যে বেদান্ত-বিচার করিতেন উহার মধুর নিনাদে ঠাকুরের বাসগৃহ সর্বদা মুখরিত থাকিত। যখন কোন উচ্চ তত্ত্বের সুমীমাংসা হইত না তখন ঠাকুরই মধ্যস্থ হইয়া স্বানুভূতির দিব্যালোকে তত্ত্বমীমাংসা করিয়া দিতেন।

কালীবাড়ীতে একবার একটী আনন্দী পরমহংস আসিলেন। তিনি ব্রহ্মের আনন্দ-স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সদানন্দ থাকিতেন। তিনি চুপ চাপ বসিয়া থাকিতেন এবং মাঝে মাঝে ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতেন। তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় একবার করিয়া ঘরের বাহিরে আসিতেন এবং গাছপালা ও আকাশ, গঙ্গাদি তাকাইয়া দেখিতেন ও আনন্দে বিভোর হইয়া দুই হাত তুলিয়া নাচিতেন। কখনো বা তিনি মহানন্দে হাসিতে হাসিতে গড়াগড়ি দিতেন, এবং বলিতেন, "বাঃ বাঃ, ক্যা দেবী মায়া! ক্যাসা প্রপঞ্চ বানায়া!!" আর একটী জ্ঞানোন্মাদ পরমহংস আসিলেন। তিনি পিশাচবৎ থাকিতেন—উলঙ্গ,

গায়ে মাথায় ধুলা, বড় বড় নখ চুল, গায়ে মড়ার কাঁথার মত একখানা কাঁথা। তিনি কালী মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া দেবী দর্শন করিতে করিতে এমন ভাবে স্তব করিলেন যে, মন্দিরটী যেন কাঁপিয়া উঠিল, এবং দেবী যেন প্রসন্না হইয়া হাসিতে লাগিলেন! কাঙ্গালীরা যেখানে বসিয়া প্রসাদ পায় সেখানে তিনি প্রসাদ পাইবার জন্য বসিতে গেলেন। কিন্তু কাঙ্গালীরা তাঁহার রুদ্র মূর্তি দেখিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল, তথায় বসিতে দিল না। কুকুররা যেখানে উচ্ছিষ্ট পাতা হইতে প্রসাদকণা সংগ্রহ করিয়া খায় অনন্তর সেখানে যাইয়া তিনি একটা কুকুরের ঘাড়ে হাত দিয়া প্রসাদ খাইতে লাগিলেন। তিনি যখন চলিয়া গেলেন তখন হৃদয়রাম ঠাকুরের নির্দেশে তাঁহার পশ্চাতে খিড়কি ফটকের বাহিরে যাইয়া কিছু উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। প্রথমে তিনি হৃদয়রামের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। কিন্তু যখন হৃদয় কিছুতেই ছাড়িলেন না এবং তাঁহার পশ্চাৎ অনুগমন করিলেন তখন পথের ধারের নর্দমা দেখাইয়া তিনি বলিলেন, "এই নর্দমার জল এবং ঐ গঙ্গার জল যখন এক বোধ হবে, সমান পবিত্র জ্ঞান হবে, তখনই ব্রহ্মজ্ঞ হবি।" এইরূপ নানা প্রকার পরমহংস তখন কালী-বাড়ীতে আসিতেন। তাঁহাদের সমাগমে কালী-বাড়ী তখন কৈলাসে পরিণত হইয়াছিল।

তুরীয় ভাবভূমিতে দীর্ঘকাল অবস্থানের ফলে ঠাকুর জাতিস্মর হইয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব ঈশ্বরাবতার। যিনি পূর্ব পূর্ব যুগে 'শ্রীরাম' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ' রূপে অবতীর্ণ হইয়া লোককল্যাণ সাধন করিয়াছিলেন তিনিই বর্তমান যুগে মানব দেহধারণপূর্বক 'শ্রীরামকৃষ্ণ' রূপে আবির্ভূত। ব্রহ্মস্বরূপে

অবস্থিতির পূর্বে জাতিস্মরত্ব লাভের কথা পাতঞ্জল যোগসূত্রের ছান্দোগ্য উপনিষদাদি শাস্ত্রে পাওয়া যায়। পাতঞ্জল যোগসূত্রের বিভূতিপাদে অষ্টাদশ সূত্রে আছে, "সংস্কার-সাক্ষাৎ-করণাৎ পূর্বজাতি-জ্ঞানং।" অর্থাৎ মনে বহু জন্মার্জিত যে সংস্কাররাশি স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে সেইগুলি অবগত হইলেই পূর্ব পূর্ব জন্মের স্মৃতি মানস পটে উদিত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে অষ্টম অধ্যায়ে দ্বিতীয় খণ্ডে আছে, তিনি যদি পিতৃলোক, মাতৃলোক, ভ্রাতৃলোক, স্বসৃলোক, সখি-লোক, অন্নপানলোক, গীতবাদিত্র লোক, নারীলোক, বা যে কোন লোক কামনা করেন সংকল্পমাত্রই তিনি সেই লোকের সহিত সম্বন্ধ হন। বিদ্যারণ্যকৃত "পঞ্চদশী"তেও আছে যে, ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ যোগৈ-শ্বর্য্য, সিদ্ধসঙ্কল্পত্ব ও সর্বজ্ঞত্বের অধিকারী হন। অদ্বৈত উপলব্ধির দ্বারা ঠাকুর ইহাও জানিয়েছিলেন যে, অদ্বৈত অনুভূতিই আধ্যাত্মিক উপলব্ধির শেষ কথা এবং যত মত তত পথ। তাই তিনি বলিতেন, "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই কর।"

"অদ্বৈত ভাবভূমিতে সমারূঢ় থাকার ফলে ঠাকুরের যে সকল অলৌকিক অনুভূতি হইয়াছিল তন্মধ্যে চারিটী এখানে বিবৃত হইল। কালীবাড়ীর প্রশান্ত উদ্যান বর্ষাকালে তৃণাচ্ছন্ন থাকে। তখন গ্রামের ঘেসেড়ারা বিনামূল্যে ঘাস কাটিয়া লইয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া কিছু অর্থ পায়। একদিন কোন বৃদ্ধ ঘেসেড়া সারাদিন ঘাস কাটিয়া একটী বৃহৎ বোঝা করিয়াছে। অপরাহ্নে সেই বৃহৎ বোঝাটী মাথায় তুলিয়া লইয়া বাজারে যাইবার জন্য বার বার চেষ্টা করিয়াও বৃদ্ধ সমর্থ হইতেছে না। ইহা দেখিতে দেখিতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, "অন্তরে জ্ঞান-স্বরূপ পরমাত্মা বিদ্যমান

এবং বাহিরে এত নির্বুদ্ধিতা, এত অজ্ঞান! হে রাম তোমার বিচিত্র লীলা!" এই বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন। আর একদিন ঠাকুর দেখিলেন, একটী ফড়িং উড়িয়া আসিতেছে এবং উহার গুহ্যদেশ একটী লম্বা কাঠি দ্বারা বিদ্ধ। কোন দুষ্ট বালক এইরূপ অন্যায় কার্য্য করিয়াছে ভাবিয়া তিনি ব্যথিত হইলেন; কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি নিজের এই দুর্দশা নিজেই করিয়াছ।" এই বলিয়া তিনি উচ্চ হাস্যের রোল তুলিলেন। দুরন্ত বালক এবং আহত পতঙ্গের মধ্যে ঠাকুর একমেব অদ্বৈত ব্রহ্ম দর্শন করিয়া আনন্দপ্লুত হইলেন। নিরন্তর স্বীয় অন্তরে এবং সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের সর্বাবস্থায় ঘটিয়া থাকে।

অদ্বৈতজ্ঞানে সমারূঢ় হওয়ায় ঠাকুর বিশ্বের সহিত নিজেকে অভিন্ন জ্ঞান করিতেন। নিম্নোক্ত ঘটনায় ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। কালীবাড়ীর উদ্যানের কিয়দংশ নবীন দুর্বাদলে একদা সমাবৃত ছিল। ইহাতে দুর্বাক্ষেত্রটি অতিশয় রমণীয় দেখাইত। একদিন ঠাকুর উহা দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং ক্ষেত্রকে সর্বতোভাবে স্বীয় অঙ্গরূপে অনুভব করিলেন। এমন সময় কোন ব্যক্তি উক্ত ক্ষেত্রের উপর দিয়া অন্যত্র যাইতে লাগিল। ইহাতে ঠাকুর বোধ করিলেন যেন লোকটি তাঁহার বুকের উপর দিয়া চলিয়া গেল। এই অদ্বৈত অনুভূতির ফলে ঠাকুর অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। সেই যন্ত্রণাদায়ক ভাবাবস্থায় তিনি প্রায় ছয় ঘণ্টা কাল আরূঢ় ছিলেন। ভাবোপশমে তিনি উক্ত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইলেন।

কালীবাড়ীর গঙ্গাতীরে যে চাঁদনীযুক্ত বৃহৎ ঘাট আছে তথায় দাঁড়াইয়া ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গঙ্গাদর্শন করিতেছিলেন। ঘাটে তখন দুইটি নৌকা লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা কোন বিষয় লইয়া পরস্পর কলহ করিতেছিল। ক্রমে কলহ বাড়িয়া উঠিল এবং সবল মাঝি দুর্বল মাঝির পিঠে সজোরে চাপড় মারিল। অদ্বৈতভাবে আরূঢ় ঠাকুর তখন সকল মানবের সহিত নিজেকে অভিন্ন জ্ঞান করিতেন। তজ্জন্য তিনি উক্ত চপেটাঘাত স্বদেহে অনুভবপূর্বক চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতর ক্রন্দন কালীঘরে অবস্থিত হৃদয়ের কর্ণগোচর হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ ঘাটে আসিয়া দেখিলেন, ঠাকুরের পৃষ্ঠদেশ লাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধান্বিত হইয়া তিনি পুনঃ পুনঃ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মামা, কে তোমায় এরূপ মারিয়াছে দেখাইয়া দাও। আমি তার মাথাটা ছিঁড়িয়া লই।" পরে ঠাকুরের ভাবাবেশ প্রশমিত হইলে তিনি বৃত্তান্তটি শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। ঠাকুর স্বয়ং এই ঘটনাটি গিরিশচন্দ্র ঘোষকে বলিয়া অদ্বৈত তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।

ইসলাম ধর্ম সাধন

অদ্বৈত ভূমিতে প্রায় ছয় মাস থাকিবার পর ঠাকুর আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। সেই ব্যাধির আক্রমণে তাঁহার মন দেহভূমিতে নামিয়া আসিল। তিনি তখন ইসলাম ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হইলেন। সহস্রাধিক বৎসর ইসলাম ধর্ম ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী উক্ত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইসলাম ধর্ম্মপথে ঈশ্বর দর্শনের জন্য ঠাকুর সুদৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। কালীবাড়ীতে তখন

হিন্দু সাধুদের ন্যায় মুসলমান ফকীরগণও সমভাবে আতিথ্য লাভ করিতেন। গোবিন্দ রায় নামক জনৈক স্ুফী দরবেশ তথায় থাকিয়া সাধন ভজন করিতেন। তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন এবং ফারসী ও আরবী ভাষা জানিতেন। তিনি কোন সুফী সাধকের নিকট দীক্ষা গ্রহণান্তে ইসলাম ধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হন। কোরাণপাঠে এবং তদুক্ত সাধন ভজনে তিনি নিযুক্ত থাকিতেন। সাধনরত গোবিন্দ রায়ের প্রতি ঠাকুর আলাপান্তে আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা লইয়া ইসলাম ধর্মসাধন আরম্ভ করেন। তখন তিনি 'আল্লা' মন্ত্র জপ করিতেন, মুসলমান দিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতেন এবং ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতেন। হিন্দুভাব তাঁহার মন হইতে উক্ত কালে সম্পূর্ণ লুপ্ত হওয়ায় হিন্দু দেবদেবীকে প্রণাম করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের দর্শন পর্য্যন্ত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। উক্ত ভাবে তিন দিন অভিভূত থাকিবার পর তিনি এক দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত সুগম্ভীর জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের দর্শন লাভ করেন। সম্ভবতঃ এই দিব্যপুরুষই ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদ। অনন্তর তাঁহার মন সগুণ ব্রহ্মের উপলব্ধিপূর্বক নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হয়। ইসলাম ধর্ম সাধন কালে ঠাকুর মুসলমানদিগের প্রিয় খাদ্যাদি গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। মথুরানাথ তখন এক মুসলমান পাচক আনাইয়া উহার নির্দেশে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা মুসলমানদিগের প্রিয় খাদ্যাদি রন্ধন করাইয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্ম সাধনকালে ঠাকুর মথুরানাথের কুঠীতেই থাকিতেন এবং কালীবাড়ীর অভ্যন্তরে একবারও আসেন নাই। উক্ত সিদ্ধি দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান বহু শতক যাবৎ বিদ্যমান তাহা

অদ্বৈত বেদান্তের আলোকেই দূরীভূত হইবে। কালীবাড়ীর অদূরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামের মধ্যে যে পুরাতন মসজিদে ঠাকুর তখন নমাজ পড়িতেন তাহা অদ্যাপি জীর্ণাবস্থায় বিদ্যমান।

ষোড়শী পূজা

নির্বিকল্প সমাধিলাভের পরে শ্রীরামকৃষ্ণদেব সারদা দেবীর সহিত বিবাহিত হন। ইহা শুনিয়া তোতাপুরী বলিয়াছিলেন, "যদি পরিণীতা পত্নীর সহিত বাস করা সত্ত্বেও মন দেহভূমিতে না নামিয়া আসে তবেই বুঝিতে হইবে মন ব্রহ্মজ্ঞানে সমারূঢ়।" সারদা দেবীর সহিত একই শয্যায় দীর্ঘকাল শয়ন করা সত্ত্বেও ঠাকুরের মন দেহ ভূমিতে নামিয়া আসিল না। পত্নী সারদার মধ্যেও পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ জগদম্বাকে দেখিতে পাইতেন। একদিন সারদা দেবতুল্য পতির পদ সম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিলেন, যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন। সাক্ষাৎ জগদম্বার জীবন্ত মূর্তি বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্যই দেখিতে পাই!"

আর একদিন ঠাকুর সারদাদেবীকে স্বীয় শয্যায় নিদ্রিতা দেখিয়া আত্মসংযম পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বীয় মনকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন—"মন, ইহারই নাম স্ত্রীশরীর। লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্য বস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্ব্বক্ষণ লালায়িত হয়। কিন্তু উহা গ্রহণ

করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়, সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। ভাবের ঘরে চুরি করিও না। মনে একটা, মুখে অন্যটা রাখিও না। সত্য বল, তুমি উহা ভোগ করিতে চাও, অথবা ঈশ্বরকে চাও। যদি উহা চাও ত, তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ কর।” এইরূপ বিচারপূর্বক ঠাকুর সারদা দেবীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইবামাত্র তাঁহার মন কুণ্ঠিত হইয়া এমন সমাধি-মগ্ন হইল যে, সেই রাত্রিতে উহা আর প্রাকৃত ভাবভূমিতে নামিল না! পরদিন বহুক্ষণ তাঁহাকে ঈশ্বরের নাম শোনাইবার পর তিনি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হন। পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনা সারদা ঠাকুরাণী বৎসরাধিক একত্র রাত্রিবাস করা সত্ত্বেও কাহারো মনে লেশমাত্র দেহবুদ্ধি আসিল না।

১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা দিবস সমাগত হইল। সেদিন ফলহারিণী কালীপূজা হইয়া থাকে। সুতরাং কালীমন্দিরে বিশেষ পূজা হইবে। ঠাকুরের কক্ষেই গুপ্তভাবে পূজার আয়োজন হইল। ঠাকুরের পূজার আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া হৃদয় কালীমন্দিরে চলিয়া গেলেন। রাধাগোবিন্দজীর নৈশ সেবাপূজাদি সমাপনান্তে দীনু পূজারী আসিয়া ঠাকুরের পূজার যোগাড়ে লাগিলেন। আলিম্পন-ভূষিত পীঠস্থান পূজকের দক্ষিণে স্থাপিত হইল। অমানিশির তিমিরাবরণ ধরিত্রীকে সমাবৃত করিল। ঠাকুরের নির্দেশে সারদা দেবী পূজাস্থানে যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর পূজায় বসিলেন। পূজোপকরণ সংশোধিত এবং পূর্বকৃত্য সম্পন্ন হইল। আলিম্পনশোভিত পীঠস্থানে উপবেশনার্থ ঠাকুর সারদাদেবীকে ইঙ্গিত করিলেন। পূজা দেখিতে দেখিতে ইতোপূর্বে সারদামণি অর্ধবাহ্য দশা

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের ইঙ্গিতে এখন তিনি মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় পূর্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণে উত্তরাস্য হইয়া বসিলেন। সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা পূজক বারম্বার পূজিতাকে যথাবিধি অভিষিক্তা করিলেন। অতঃপর পূজিতার অঙ্গে মন্ত্রমালার ন্যাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে ষোড়শ উপচারে পূজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদনান্তে নিবেদিত বস্তুসমূহের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে দিলেন। ঠাকুরও সমাধিমগ্ন এবং সারদামণিও সমাধিস্থা হইলেন। সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা পূজিতার সহিত আত্মস্বরূপে একীভূত হইলেন। বহুক্ষণ এই দিব্য ভাবে কাটিল। অমানিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুকাল অতীত হইল। আত্মারাম ঠাকুরের বাহ্যদশা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। ষোড়শী পূজা শেষ হইল। তখন সারদা বিশ বৎসরের যুবতী। পূজার দ্বারা মানবী দেবীপদবীতে আরূঢ়া হইলেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে স্বীয় পরিণীতা পত্নীকে বলিতেছেন, "নবা অরে মৈত্রেয়ি, পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।" অর্থাৎ হে মৈত্রেয়ি, পতির দেহের জন্য পতি পত্নীর প্রিয় হয় না। উভয়ের মধ্যে যে আত্মা বিদ্যমান উহাই দাম্পত্য-প্রীতির মূলসূত্র। ষোড়শী পূজার পর সারদামণি প্রায় পাঁচ মাস ঠাকুরের কক্ষে রাত্রিবাস করিলেন। কিন্তু দিনের ন্যায় রাত্রিতেও ঠাকুরের ভাবসমাধির বিরাম হইত না। কখনো কখনো তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন হইতেন। তখন তাঁহার দেহে মৃত্যুর লক্ষণসমূহ প্রকাশিত হইত। সেইজন্য শ্রীমা সারারাত্রি ভীতা থাকিতেন এবং তাঁহার চক্ষে নিদ্রা আসিত না। ইহা জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে নহবতে রাত্রিবাসের জন্য নির্দেশ দিলেন। এবার

ঠাকুরের কাছে এক বৎসর চারি মাস থাকিবার পর সারদামণি কামার-পুকুরে প্রত্যাগমন করিলেন।

শ্রীষ্টধর্ম সাধন

কলিকাতা সিঁদুরিয়াপটী পল্লীর শ্রীশম্ভুচরণ মল্লিক শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বিতীয় রসদ্দার ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর এবং শ্রীমাকে প্রায় চারি বৎসরকাল সেবা করিয়া ধন্য হন। তিনি দানশীল ধনশালী ঈশ্বর-ভক্ত ছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরকে অতিশয় ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। ঠাকুর বা শ্রীমার যখন যাহা আবশ্যক হইত, জানিতে পারিলে শম্ভুচরণ অবিলম্বে তাহা আনিয়া দিতেন। শম্ভুচরণ ঠাকুরকে 'গুরুজী' বলিয়া ডাকিতেন। উক্ত সম্বোধনে ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "কে কার গুরু? তুমি আমার গুরু!" শম্ভুচরণ ইহাতে নিরস্ত না হইয়া চির কাল ঠাকুরকে এই ভাবে সম্বোধন করিতেন। রাণী রাসমণির কালী-বাড়ীর দক্ষিণে অদূরে আলমবাজারের দিকে শম্ভুচরণের একটী বাগান-বাটী ছিল। ঠাকুর তথায় মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইতেন। তথায় শম্ভুচরণ ঠাকুরের দিব্য সঙ্গে ভগবৎচর্চায় অনেক সময় কাটাইতেন এবং বাইবেল পড়িয়া ঈশার জীবনী ও বাণী ঠাকুরকে শুনাইতেন। শম্ভুচরণের ধর্মপ্রাণা পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে তাঁহাকে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া প্রতি মঙ্গল বারে ফুল চন্দন দিয়া তাঁহার পদপূজা করিতেন। ।*

---

*স্বামী সারদানন্দ প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ," (সাধকভাব) পরিশিষ্ট ৫-৭ পৃষ্ঠা দেখুন।

শ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে দ্বিতীয়বার ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে আসেন এবং সঙ্কীর্ণ নহবত-ঘরে স্বীয় শ্বশ্রূ চন্দ্রামণি দেবীর সহিত বাস করেন। তথায় শ্রীমার অবস্থান অসুবিধাজনক ভাবিয়া শম্ভুচরণ কালীবাড়ীর সন্নিকটে কিছু জমি ২৫০৲ টাকায় মৌরসী করিয়া লন এবং তদুপরি একটী প্রশস্ত চালা-ঘর বাঁধিয়া দেন। উক্ত চালা-ঘর নির্মাণে নেপাল সকরারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায় ৩।৪ খানি সালকাঠ দিয়াছিলেন। এই ঘরে শ্রীমা প্রায় এক বৎসর কাল বাস করেন। তিনি তথায় প্রত্যহ ঠাকুরের জন্য বিবিধ খাদ্য রন্ধন করিয়া কালী-বাড়ীতে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার ভোজনান্তে ফিরিয়া আসিতেন। শ্রীমার সন্তোষ বিধান ও তত্ত্ববধানের জন্য ঠাকুরও কখনো কখনো দিবাভাগে তথায় যাইতেন এবং কিছুক্ষণ তথায় থাকিয়া কালীবাড়ীতে ফিরিতেন। একদিন বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত মুসলধারে বৃষ্টিপাত হওয়ার ঠাকুর রাত্রিতে তথায় থাকিতে বাধ্য হন। ১২৮২ সালের ভাদ্র বা আশ্বিন মাসে শ্রীমা তথায় আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। শম্ভুচরণ প্রসাদ ডাক্তারের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করেন। শম্ভুচরণের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার ফলে কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া শ্রীমা জয়রাম-বাটীতে গিয়াছিলেন।

শম্ভুচরণের বাগান-বাড়ীতে একটী দাতব্য ঔষধালয় ছিল। ঠাকুরের পেটের অসুখ প্রায়ই হইত বলিয়া তিনি ঔষধাদি আনিতে বা পথ্যাদির পরামর্শ লইতে তথায় কখনো কখনো যাইতেন। পেটের অসুখ কিছুতেই সারিতেছে না জানিয়া শম্ভুচরণ তাঁহাকে আফিম খাইতে পরামর্শ দেন এবং কালী-বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার পূর্বে একটু আফিম

তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইতে বলেন। অনন্তর প্রসঙ্গান্তরে প্রবৃত্ত হইয়া উভয়ে এই কথা ভুলিয়া যান। কথাবার্তার পর শম্ভুচরণ অন্দর মহলে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর তখন ঔষধালয়ের কর্মচারীর নিকট হইতে একটু আফিম চাহিয়া লইয়া কালী-বাড়ীর দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু দিক্‌ভ্রান্ত পথচারীর ন্যায় তিনি কালীবাড়ীর অভিমুখে পথ দেখিতে পাইলেন না, কে যেন রাস্তার পার্শ্বস্থ নর্দমার দিকে তাঁহার পা টানিতে লাগিল। আশ্চর্য্যের বিষয়, শম্ভু মল্লিকের বাগান-বাড়ীর দিকে তাকাইয়া তিনি পথ দেখিতে পাইলেন। তিনি উক্ত বাগানের ফটক পর্য্যন্ত ফিরিয়া যাইয়া পুনরায় সাবধানে কালীবাড়ীর দিকে চলিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু দুই এক পা অগ্রসর হইয়াই পূর্ববৎ পথ দেখিতে পাইলেন না। কয়েক বার উক্ত চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় তিনি বুঝিলেন, শম্ভু মল্লিকের নিকট হইতে আফিম না লওয়ায় মিথ্যা ও চুরির দোষ হইতেছে এবং তজ্জন্য এইরূপ ঘটিতেছে। ইতোমধ্যে কর্মচারীও ঔষধালয় বন্ধ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। ঠাকুর আফিমের মোড়কটী জানালার মধ্য দিয়া ঔষধালয়ের ভিতর ফেলিয়া দিলেন। অতঃপর যখন কালী-বাড়ীর দিকে চলিতে লাগিলেন তখন তিনি পথ স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইলেন। ঠাকুর শিশুবৎ জগন্মাতার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করায় জগন্মাতা সর্বদা তাঁহার হাত ধরিয়া ছিলেন এবং তাঁহার পা আদৌ বেচালে পড়িতে দেন নাই।*

প্রায় চারি বৎসর ঠাকুরের সেবা ও সঙ্গ লাভ করিয়া ভাগ্যবান্ শম্ভুচরণ ধর্মপথে বিশেষ আলোক দেখিতে পাইলেন। তিনি দীর্ঘকাল

---

*"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ" (গুরুভাব, পূর্বার্ধ) ৫৭-৫৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। উক্ত রোগের বৃদ্ধি ও বিকার উপস্থিত হওয়ায় তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। ঠাকুর তাঁহার এই দ্বিতীয় রসদ্দারকে পীড়িতাবস্থায় একবার দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "শম্ভুর প্রদীপে তৈল নাই।" ঠাকুরের কথাই সত্য হইল। শম্ভুচরণ উক্ত রোগেই দেহত্যাগ করিলেন। অন্তিম শয্যায় তাঁহার মানসিক প্রসন্নতার অভাব মুহূর্তের জন্যও হয় নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি হৃষ্ট চিত্তে বলিয়াছিলেন, "মরণের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই। আমি পুঁটলী পাঁটলা বেঁধে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি।" ঈশ্বরাবতারের সেবা ও সঙ্গ করিয়া শম্ভুচরণের মৃত্যু-ভয় দূরীভূত হইয়াছিল। শম্ভুচরণকে প্রথম দেখিবার পূর্বে ঠাকুর তাঁহাকে ভাবনেত্রে স্বীয় রসদ্দার-চতুষ্টয়ের অন্যতমরূপে দেখিয়াছিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণীর শিষ্যা এবং ঠাকুরের গুরুভ্রাতা গিরীজাও কালী-বাড়ীতে অবস্থান কালে শম্ভু মল্লিকের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গেই তিনি একদিন তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহার সিদ্ধাই প্রকাশ করেন। উভয় গুরুভ্রাতা কথাবার্তায় অনেকক্ষণ কাটাইলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভক্তদের গাঁজাখোরের মত স্বভাব হয়। গাঁজাখোর যেমন গাঁজার কল্‌কেতে ভরপুর একদম লাগিয়ে কল্‌কেটা অপরের হাতে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে—অপর গাঁজা-খোরের হাতে ঐরূপে কল্‌কেটা না দিতে পারলে যেমন তার একলা নেশা করে সুখ হয় না; ভক্তরাও সেইরূপ একসঙ্গে জুট্‌লে একজন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ ভাবে তন্ময় হয়ে বলে ও আনন্দে চুপ করে অপরকে ঐ কথা বলতে অবসর দেয় ও শুনে আনন্দ পায়।" সেদিন ঠাকুর গিরিজা ও শম্ভু বাবু একত্রে মিলিত হওয়ায় ধর্মপ্রসঙ্গে কিরূপে যে

সময় কাটিল তাহা কেহই টের পাইলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগতা ও রাত্রির প্রথম প্রহর অতীত হইল। তখন স্বীয় কক্ষে ফিরিবার জন্য ঠাকুরের হুঁস আসিল। শম্ভু বাবুর নিকট বিদায় লইয়া ঠাকুর রাস্তায় আসিলেন এবং গিরিজার হাত ধরিয়া কালীবাড়ীর দিকে চলিতে লাগিলেন। চারি দিকে তখন ভীষণ অন্ধকার ছিল। ভগবৎ-প্রসঙ্গের ঝোঁকে শম্ভুবাবুর নিকট হইতে ঠাকুর একটা লণ্ঠনও চাহিয়া আনেন নাই। অন্ধকারে পথ দেখিতে না পাওয়ায় চলিতে তাঁহার খুব কষ্ট হইল, প্রতিপদে পদস্খলন ও দিক্‌ভ্রম হইতে লাগিল। তাঁহার এইরূপ কষ্ট দেখিয়া গিরিজা তাঁহাকে বলিলেন, "দাদা, একবার দাঁড়াও আমি তোমায় আলো দেখাইতেছি।" এই বলিয়া তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং স্বীয় পৃষ্ঠদেশ হইতে জ্যোতির একটা লম্বা ছটা নির্গত করিয়া পথ আলোকিত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "সে ছটায় কালীবাড়ীর ফটক পর্য্যন্ত বেশ দেখা যাইতে লাগিল এবং আমি আলোয় আলোয় অনায়াসে চলিয়া আসিলাম।" ইহা বলিয়াই ঠাকুর ঈষৎ হাস্যে আবার বলিতেন, "কিন্তু তার ঐরূপ ক্ষমতা আর বেশী দিন রইল না। এখানকার (তাঁহার নিজের) সঙ্গে কিছুদিন থাকতে ঐ সকল সিদ্ধাই চলে গেল।" শিষ্যগণ পরবর্ত্তী কালে ঠাকুরের মুখে গিরিজার সিদ্ধাইনাশের কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার কারণ কি? ঠাকুর নিজ শরীর দেখাইয়া উত্তর দিলেন, "মা এর ভিতরে তার কল্যাণের জন্য তার সিদ্ধাই বা শক্তি আকর্ষণ করে নিলেন। আর ঐরূপ হবার পর তার মন ঐসব ছেড়ে আবার ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল।"

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত শ্রীযদুনাথ মল্লিকের

বাগান-বাড়ীতেও ঠাকুর মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন। যদুনাথ ও তাঁহার মাতা ঠাকুরকে অশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন এবং তাঁহারা তথায় না থাকিলেও তত্রস্থ কর্মচারিগণ গঙ্গার ধারের বৈঠকখানা খুলিয়া দিয়া তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করিতেন। ৺ষোড়শী পূজার প্রায় এক বৎসর পরে, সম্ভবতঃ ১২৮১ সালের প্রথমার্ধে, ঠাকুর একদিন উক্ত বাগানে বেড়াইতে গিয়াছেন এবং বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। উক্ত ঘরের দেওয়ালে কতকগুলি উৎকৃষ্ট আলেখ্য বিলম্বিত ছিল। তন্মধ্যে একখানি ছবি ছিল মাতা মেরীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট ঈশার শিশুমূর্তি। ইতোপূর্বে তিনি শম্ভু মল্লিকের নিকট বাইবেলোক্ত ঈশা-জীবনী শুনিয়াছিলেন। সেদিন তথায় বসিয়া ঈশার ছবিখানি তন্ময় হইয়া দেখিতে দেখিতে ঈশার অলৌকিক জীবন-কথা তিনি ভাবিতে লাগিলেন। এমন সময় দেখিলেন, অদ্ভুত দেব-জননী ও দেব-শিশু যেন জীবন্ত ও জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদের দেহ হইতে নির্গত জ্যোতির রশ্মিজাল তাঁহার অন্তরে প্রবেশপূর্বক তাঁহার মনোভাব আমূল পরিবর্তিত করিতেছে। ইহার ফলে জন্মগত হিন্দু সংস্কারসমূহ তিরোহিতপ্রায় হইল এবং ঈশা-ভক্তি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি মানস নয়নে দেখিলেন, "খ্রীষ্টীয় পাদ্রীগণ গির্জায় বসিয়া খ্রীষ্ট-মূর্তির সম্মুখে ধূপ-দীপ দিতেছেন এবং ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিতেছেন।" ঠাকুর কালী-বাড়ীতে ফিরিয়া নিরন্তর এই ধ্যানে মগ্ন রহিলেন এবং ভবতারিণীর মন্দিরে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবার নিত্য অভ্যাসও ভুলিয়া গেলেন। তিন দিন যাবৎ উক্ত ভাব-তরঙ্গ তাঁহার মনো-রাজ্যে প্রভুত্ব করিল। তৃতীয় দিবসের অবসানে পঞ্চবটী-তলে বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি দেব-মানব জীশু খ্রীষ্টের দর্শন

পাইলেন। উক্ত অলৌকিক দর্শন মাত্র তাঁহার পূত হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে ধ্বনিত হইল, "ইনি ঈশামসি। দুঃখ যাতনা হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হৃদয়ের শোণিত দান এবং মানব হস্তে অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন ইনি সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরম যোগী ও প্রেমিক খ্রীষ্ট ঈশামসি।" জীশু খ্রীষ্ট ঠাকুরকে আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহার দেহে বিলীন হইলেন। তখন ঠাকুর ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া সগুণ ব্রহ্মের ধ্যানে কিছুক্ষণ নিমগ্ন রহিলেন। এই দিব্যদর্শন ও ভাবসমাধির ফলে ঠাকুর নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে বুঝিলেন, জীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরাবতার।

ঠাকুর যে খ্রীষ্ট-মূর্তি দেখিয়াছিলেন তাহা সৌম্য সুন্দর ও গৌরবর্ণ এবং উহার চক্ষু বিশ্রান্ত; কিন্তু নাসিকা একটু চাপা। কিন্তু বাইবেলের মতে খ্রীষ্টের নাসিকা দীর্ঘ ও টিকাল। পরবর্তী কালে ঠাকুরের শিষ্যগণ অনুসন্ধানের ফলে জানিয়াছিলেন, "ঠাকুরের দর্শন সম্পূর্ণ সত্য। জিশু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে যে তিনটী বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে তন্মধ্যে একটীতে উল্লিখিত আছে যে, তাহার নাক একটু চাপা ছিল। ইংরাজ মনীষি এইচ. জি. ওয়েল্স কৃত A Short History of the World পুস্তকে জিশু খ্রীষ্টের উক্তরূপ চিত্র ও বর্ণনা পাওয়া যায়।

যদু মল্লিকের বাগানে আর একটী উল্লেখযোগ্য অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। ১৮৮১ খ্রীঃ স্বামী বিবেকানন্দ ওরফে নরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন ঠাকুরকে তৃতীয় বার দর্শন করিতে কালীবাড়ীতে আসেন তখন ঠাকুর তাঁহাকে উক্ত উদ্যানে লইয়া যান। ঠাকুর উদ্যানে ও গঙ্গাতীরে কিছুক্ষণ ভ্রমণান্তে বৈঠকখানায় আসিয়া বসেন এবং সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। নরেন্দ্রনাথ অনতিদূরে উপবিষ্ট হইয়া ঠাকুরের সমাহিত অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন। এমন সময় ঠাকুর আসিয়া তাঁহাকে

স্পর্শ করিলেন। সমাধিস্থ দেব-মানবের শক্তিময় অঙ্গস্পর্শে নরেন্দ্রনাথ বাহ্য সংজ্ঞা হারাইলেন। সংজ্ঞা শূন্য নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর সেদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?', 'কোথা হইতে আসিয়াছ?', 'কতদিন এখানে থাকিবে?' ইত্যাদি। উক্ত প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর পাইয়া ঠাকুর জানিলেন, "নরেন্দ্র ধ্যানসিদ্ধ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ। যখন তিনি জানিতে পারিবেন তিনি কে, তখন সমাধিস্থ হইয়া দেহরক্ষা করিবেন।" জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলীর উত্তরসমূহ পাইয়া ঠাকুর নরেন্দ্রের বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন এবং নরেন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইলেন।

যদু মল্লিকের বাগান-বাটীর কিয়দংশ বালি পুল নির্মাণকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছে। অবশিষ্ট অংশে শ্রীরামকৃষ্ণ মহামণ্ডল প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক বৎসর ১লা জানুয়ারী তারিখে মহামণ্ডলে কল্পতরু উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ খ্রীঃ তথায় অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ বার্ষিক উৎসবে পশ্চিম বঙ্গের বর্তমান প্রদেশপাল ডাঃ হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন এবং দার্শনিক স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বক্তৃতা দেন।

———

অষ্টম অধ্যায়

শিষ্য-ভক্তবৃন্দের সহিত মিলন

ঠাকুর সত্যই বলিতেন, "ফুল ফুটিলেই ভ্রমর আপনি আসিয়া জুটে; তাহাকে ডাকিয়া আনিতে হয় না।" তিনি যখন দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী

অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক সাধনাসমূহে সংসিদ্ধ হইলেন তখন তাঁহার নিকটে নানা স্থান হইতে সাধু-ভক্তগণ স্বতঃই আসিতে লাগিলেন। গুরু, কর্তা বা বাবা বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন এবং বলিতেন, "ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, কর্তা ও বাবা। আমি হীনের হীন, দাসের দাস। তোদের গায়ের একগাছি ছোট লোমের সমান, একগাছি বড় লোমের সমানও নই।' তাঁহার 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি একেবারে লোপ পাইয়াছিল। বুদ্ধদেবের ন্যায় তিনি নিজেকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেন, এখানে বা এখানকার। তিনি যেদিন একটু অভিমান করিতেন এবং 'আমি' 'আমার' বলিতেন তার পরদিনই অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে ১৮৫৫ খ্রীঃ হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল বাস করেন। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে প্রথম দুই দশক অর্থাৎ বিশ বৎসরকে তাঁহার সাধনকাল বলা যাইতে পারে। অবশিষ্ট দশক তাঁহার সিদ্ধাবস্থা ও গুরুভাবের কাল। সুতরাং ১৮৭৫ খ্রীঃ হইতে ১৮৮৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত দশ বৎসর তাঁহার নিকট শিষ্য ভক্ত-বৃন্দের আগমন ঘটে।

স্বামী সারদানন্দ সত্যই বলিয়াছেন, "দিব্য ভাবমুখে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত চরিত্র বুঝিতে হইলে ভক্তসঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে হইবে।" কারণ ভক্তসঙ্গেই তাঁহার অলৌকিক আধ্যাত্মিকতা সর্বাপেক্ষা প্রকটিত হয়। অন্তরঙ্গ ভক্তদের সহিত মিলিত হইবার জন্য ঠাকুর আকুল হইতেন এবং কখনো কখনো কাঁদিতেন। তখন হইতে তাঁহার নিকট ভক্তগণের সমাগম হইতে লাগিল। কেশবচন্দ্র সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, রাখাল চন্দ্র ঘোষ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), বলরাম বসু, বাবুরাম ঘোষ

(স্বামী প্রেমানন্দ), রামচন্দ্র দত্ত, যোগীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী (স্বামী যোগানন্দ), শিবনাথ শাস্ত্রী, নিত্যনিরঞ্জন সেন (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, তারকনাথ ঘোষাল (স্বামী শিবানন্দ), মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী (স্বামী সারদানন্দ), দুর্গাচরণ নাগ, শশিভূষণ চক্রবর্তী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ), মনোমোহন মিত্র, হরিপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় (স্বামী বিজ্ঞানানন্দ), জয়গোপাল সেন, হরিনাথ চট্টোপাধ্যায় (স্বামী তুরিয়ানন্দ), মণিমোহন মল্লিক, গঙ্গাধর ঘটক (স্বামী অখণ্ডানন্দ), সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, সারদাপ্রসন্ন মিত্র (স্বামী ত্রিগুণাতীত), অধরলাল সেন, কালীপদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ), হরমোহন মিত্র, লাটুরাম রাখতুরাম (স্বামী অদ্ভুতানন্দ), সিন্ধুদেশের হীরানন্দ, নেপালের বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র ঘোষ (স্বামী অদ্বৈতানন্দ), গোলাপ সুন্দরী দেবী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অঘোরমণি দেবী (গোপালের মা) সন্ন্যাসিনী গৌরী পুরী, যোগীন্দ্রমোহিনী বিশ্বাস, শম্ভূচরণমল্লিক, নারায়ণ শাস্ত্রী, যদুনাথ মল্লিক প্রভৃতি বহু ভক্ত ও শিষ্য ঠাকুরের কাছে আসেন। ভক্তগণের মধ্যে সতের আঠার জন ঠাকুরের অদর্শনের পর সন্ন্যাসী হইয়া যান। গৃহী শিষ্যবর্গের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র ঘোষকে এবং সন্ন্যাসী শিষ্যগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ ও নিরঞ্জনানন্দকে ঠাকুর অন্তরঙ্গ ঈশ্বরকোটী বলিয়া নির্দেশ করিতেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে বরাহনগরে আদি রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করেন। উক্ত মঠ ১০৯২ খ্রীঃ আলমবাজারে উঠিয়া যায় এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষে বেলুড় গ্রামে আসে। বেলুড় গ্রামে উহা প্রথমে ভাড়া-বাড়ীতে ছিল। কয়দিন খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে উহা বর্তমান স্থায়ী গৃহে ছোট খাটে

গৃহী শিষ্যগণের মধ্যে রামচন্দ্র দত্ত কাঁকুড়গাছিতে (কলিকাতা নারিকেলডাঙ্গার এক পল্লীতে) যোগোদ্যান স্থাপন করেন ঠাকুরের জীবৎকালে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। ঠাকুর তথায় একবার পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভক্তবর রামচন্দ্রেরও কয়েকটী সন্ন্যাসী শিষ্য ও প্রশিষ্য ছিলেন। যোগোদ্যান অধুনা বেলুড় মঠের অঙ্গীভূত হইয়াছে। ঠাকুরের দুই সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী অভেদানন্দ ও নির্মলানন্দ কলিকাতায় যথাক্রমে রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ ও বিবেকানন্দ মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত সঙ্ঘদ্বয় অদ্যাপি স্বতন্ত্রভাবে বিদ্যমান। গৃহী শিষ্য শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ওরফে 'শ্রীম' ঠাকুরের উপদেশাবলী "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে" (৫ম খণ্ডে) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঠাকুরের অমৃত বাণীর এরূপ বিশুদ্ধ ও অপূর্ব বিবরণ অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। স্বামী সারদানন্দ ঠাকুরের বিস্তৃত জীবনী "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গে" (৫ খণ্ডে) লিখিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র দত্ত এবং সুরেশ চন্দ্র দত্ত কর্তৃক লিপিবদ্ধ ঠাকুরের জীবনী ও উপদেশ স্বতন্ত্র গ্রন্থে পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষকে বাংলার নাট্য সম্রাট এবং বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের জনক বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঠাকুর বলিতেন, গিরিশের 'পাঁচ সিকে পাঁচ আনা' বিশ্বাস। কাশীপুরের উদ্যান-বাটীতে ১৮৮৬ খ্রীঃ ১লা জানুয়ারী গিরিশই ঠাকুরকে নতজানু হইয়া করযোড়ে ভক্তিভরে বলিয়াছিলেন, "ব্যাস বাল্মীকি যাঁহার ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কি আর বলিতে পারি ?"

তাঁহ। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানের শেষ তিন চারি বৎসর ঠাকুরের নিকট বিজয়কৃষ্ণ ক্তের সমাগম হইয়াছিল। ঠাকুর ভাদ্র মাসের প্রথমে ১৮৮৫ ঘোষ, রাখাল বরের শেষে দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায়

গমন করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষাংশ হইতে কলিকাতা গমন পর্য্যন্ত কত ধর্মাপিপাসু তাঁহার নিকট আসিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। স্বামী সারদানন্দ বলেন, "বাস্তবিক ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে ঠাকুরের লোকোত্তর ভাব, প্রেম, সমাধি এবং অমৃতময়ী বাণীর কথা মুখে মুখে এতদূর প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাঁহার পুণ্যদর্শন লাভের আশায় নিত্যই দলে দলে লোক দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইতেছিল এবং যাহারা একবার আসিতে-ছিল তাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই মোহিত হইয়া তদবধি পুনঃ পুনঃ আসিতে লাগিল।

১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্চ মাসে কেশব সেন ঠাকুরকে প্রথম দর্শনান্তে তৎসম্পাদিত "সুলভ সমাচার" (বাংলা) এবং "ইণ্ডিয়ান মিরর" (ইংরাজি) পত্রিকাদ্বয়ে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর হইতে ঠাকুরের নিকট লোক-সমাগম বাড়িতে লাগিল। সেইজন্য ঠাকুর কেশবকে তৎসম্বন্ধে তাঁহার পত্রিকাদ্বয়ে কিছু লিখিতে নিষেধ করেন। দক্ষিণেশ্বরে শেষ দশ বৎসর লোকসমাগম বৃদ্ধিহেতু তাঁহার নিয়মিত স্নানাহার ও বিশ্রামের ব্যাঘাত হইতেছিল। লোকশিক্ষার্থ অত্যধিক পরিশ্রমই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রধান কারণ। ধর্মপিপাসু-গণের জনতা দক্ষিণেশ্বরে বাড়িতেছে দেখিয়া ১৮৮৫ খ্রীঃ জুলাই মাসে ভাবাবেশে ঠাকুর জগন্মাতাকে একদিন বলিয়াছিলেন, "এত লোক কি আন্‌তে হয়? একেবারে ভিড় লাগিয়ে দিয়েছিস্! লোকের ভিড়ে নাইবার খাইবার সময় পাই না! একটা তো এই ফুটো ঢাক (নিজ শরীর লক্ষ্য করিয়া)। রাত দিন এটাকে বাজালে আর কয়দিন টিকবে?" আর একদিন ভাবাবিষ্ট ঠাকুর স্বীয় কক্ষে ছোট খাটে

বসিয়া জগদম্বাকে বলিতেছিলেন, "যত সব এঁদো লোককে এখানে আনবি। এক সের দুধে একেবারে পাঁচ সের জল! ফুঁদিয়ে জাল ঠেলতে ঠেলতে আমার চোখ গেল, হাড় মাটি হ'লো! এত করতে আমি পারব না। তোর সখ থাকে, তুই করগে যা! ভাল লোক সব নিয়ে আয়, যাদের দু এক কথা বলে দিলেই চৈতন্য হবে।" অন্য একদিন ঠাকুর সমবেত অন্তরঙ্গগণকে বলিয়াছিলেন, "মাকে আজ বলিতেছিলাম, বিজয়, গিরীশ, কেদার, রাম, মাষ্টার—এই কয়জনকে একটু একটু শক্তি দে যাহাতে নূতন কেহ আসিলে ইহাদের দ্বারা কতকটা তৈয়ারী হইয়া আমার নিকটে আসে।"

নরেন্দ্রনাথের আগমনের কিছু পূর্ব হইতেই ভক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ঠাকুরের নিকট গমনাগমন আরম্ভ করেন। পূর্ববঙ্গের ঢাকা সহর ছিল তাঁহার কর্মস্থল। সেইজন্য তিনি পূজাদির অবকাশেই ঠাকুরের কাছে আসিতেন। একদিন তাঁহার সহিত ঠাকুর নরেন্দ্র নাথের তর্ক বাধাইয়া দেন। নরেন্দ্রনাথের ভজন শুনিয়া ঠাকুরের সমীপে কেদারের ভাবাবেশ হইত। কেদার বিদায় গ্রহণ করিবার পর ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিরে, কেমন দেখলি? কেমন ভক্তি বল দেখি? ভগবানের নামে একেবারে কেঁদে ফেলে! হরি বলতে যার চোখে ধারা বয় সে জীবন্মুক্ত। কেদারটী বেশ—নয়?"

কুচবিহারের মহারাজার সহিত কেশবচন্দ্রের কন্যা বিবাহিতা হওয়ায় ব্রাহ্ম সমাজে কেশবচন্দ্র ও বিজয়কৃষ্ণ স্বতন্ত্র হইয়া যান। উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উভয়ে স্ব স্ব দলবল সহ একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কেশব

ও বিজয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ও মতবিরোধ দূর করিবার জন্য সেদিন ঠাকুর উভয়কে বলিয়াছিলেন, "দেখ, ভগবান্ শিব ও রামচন্দ্রের মধ্যে এক সময়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়া ভীষণ যুদ্ধের অবতারণা হইয়াছিল। শিবের গুরু রাম এবং রামের গুরু শিব—একথা প্রসিদ্ধ। সুতরাং যুদ্ধান্তে তাঁহাদের পরস্পরে মিলন হইতে বিলম্ব হইল না। কিন্তু শিবের চেলা ভূতপ্রেতাদির সঙ্গে রামের চেলা বানরগণের আর কখনও মিলন হইল না। ভূতে বাঁদরে লড়াই সর্বক্ষণ চলিতে লাগিল। (কেশব ও বিজয়কে সম্বোধন করিয়া) যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। তোমাদিগের পরস্পরে এখন আর মনোমালিন্য রাখা উচিত নহে। উহা ভূত ও বাঁদরগণের মধ্যেই থাকুক্।" ঠাকুরের প্রভাবে বিজয়কৃষ্ণ ধর্মজীবনে সমধিক উন্নত হন। কীর্তনকালে তাঁহার উদ্দাম নৃত্য ও ভাবসমাধি দেখিয়া লোকে মোহিত হইত। তাঁহার উচ্চাবস্থা সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "যে ঘরে প্রবেশ করিলে লোকে ঈশ্বর সাধনে পূর্ণত্ব লাভ করে তাহার পার্শ্বের ঘরে পৌঁছিয়া বিজয় দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য করাঘাত করিতেছে।"

ঢাকায় অবস্থান কালে বিজয়কৃষ্ণ একদিন স্বীয় কক্ষ বন্ধ করিয়া ঈশ্বর-চিন্তা করিতে করিতে ঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন পান। উহা মাথার খেয়াল কি না পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি সম্মুখস্থ দৃষ্ট মূর্তির দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বহুক্ষণ স্বহস্তে টিপিয়া যাচাইয়া লন। একদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে সমবেত ভক্তগণকে উক্ত দর্শন সম্বন্ধে মুক্ত কণ্ঠে বলিবার সময় মন্তব্য করেন, "দেশ বিদেশ পাহাড়-পর্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধু মহাত্মা দেখলাম; কিন্তু (ঠাকুরকে দেখাইয়া) এমনটি আর কোথাও দেখলাম না। এখানে যে ভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখছি,

তাহারই কোথাও দুআনা, কোথাও এক আনা, কোথাও এক পাই, কোথাও আধ পাই মাত্র। চার আনাও কোথাও দেখলাম না।"

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রীও ঠাকুরের কাছে আসিতেন। কিন্তু বিজয় প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতাগণ ঠাকুরের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় তিনি স্বদল ভঙ্গভয়ে দক্ষিণেশ্বরে আসা বন্ধ করেন। তিনি নরেন্দ্রনাথকেও ঠাকুরের নিকট যাইতে নিষেধপূর্বক বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের ভাবসমাধি প্রভৃতি স্নায়ুদৌর্বল্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অত্যধিক শারীরিক কঠোরতার অনুষ্ঠানে তাঁহার মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে।" শিবনাথ ভাবিতেন, ঠাকুরের সমাধি স্নায়ুবিকার প্রসূত রোগবিশেষ। তাঁহার এই উক্তি ঠাকুরের কর্ণে উপস্থিত হইল। একদিন শিবনাথ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন। তখন ঠাকুর পূর্বোক্তি উদ্ধৃত করিয়া শিবনাথকে বলিলেন, "হাঁ শিবনাথ! তুমি নাকি এগুলোকে রোগ বল? আর বল যে, ঐ সময়ে অচৈতন্য হয়ে যাই? তোমরা ইট, কাঠ, মাটি, টাকা এই সব জড় জিনিষ গুলোতে দিন রাত মনে রেখে ঠিক থাকলে, আর যাঁর চৈতন্যে জগৎসংসারটা চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে তাঁকে দিন রাত ভেবে আমি অজ্ঞান অচৈতন্য হলুম! এ কোন দেশী বুদ্ধি তোমার?" ঠাকুরের কথা শুনিয়া শিবনাথ নিরুত্তর হইয়া গেলেন।

১২৮৫ সালের (১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের) শেষে রামচন্দ্র দত্ত ও মনোমোহন মিত্র কেশব-পরিচালিত সংবাদ-পত্রে ঠাকুরের কথা পড়িয়া তাঁহার নিকটে আসেন। ঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভে তাঁহাদের জীবনে কিরূপ বিপুল পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে উপস্থিত হয় তাহা ভক্ত রামচন্দ্র তৎকৃত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনবৃত্তান্ত" শীর্ষক পুস্তকে বিবৃত

করিয়াছেন। ঠাকুর রামচন্দ্রকে এবং গিরিশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে বকল্‌মা দাও।"

১২৮৭ সালের শেষ ভাগ অর্থাৎ ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ত্যাগী ভক্তবৃন্দ একে একে তাঁহার নিকট আসেন। শোনা যায়, তন্মধ্যে রাখালচন্দ্র ঘোষই প্রথমে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হন। ইনি মনোমোহন মিত্রের ভগিনীর সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। উক্ত বিবাহের স্বল্প কাল পরেই তিনি ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। ঠাকুর বলিতেন, "রাখাল আসিবার কয়েক দিন পূর্বে দেখিতেছি, মা কালী একটি বালককে আনিয়া সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, 'এটি তোমার পুত্র।' ইহা শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম, 'সে কি? আমার আবার ছেলে কি?' তিনি তাহাতে হাসিয়া আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, সাধারণ সংসারীভাবের ছেলে নহে, ত্যাগী মানস পুত্র।' তখন আশ্বস্ত হই। ঐ দর্শনের পরই রাখাল আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বুঝিলাম, এই সেই বালক।"

ঈশ্বরকোটী গৃহী ভক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ যখন ঠাকুরের কাছে আসিলেন তখন ঠাকুর তাঁহাকে সস্নেহে উপদেশ প্রদান ও জলযোগাদি করাইয়া ফিরিবার কালে বলিয়াছিলেন, "তোর যখনই সুবিধা হইবে চলিয়া আসিবি, গাড়ী করিয়া আসিবি। যাতায়াতের ভাড়া এখান হইতে দিবার বন্দোবস্ত থাকিবে।" পরে ঠাকুর ভক্তগণকে বলিলেন, "পূর্ণ নারায়ণের অংশ, সত্ত্বগুণী আধার। নরেন্দ্রের নীচেই পূর্ণের এই বিষয়ে স্থান বলা যাইতে পারে। এখানে আসিয়া ধর্মলাভ করিবে বলিয়া যাহাদিগকে বহু পূর্বে (ভাবনেত্রে) দেখিয়াছিলাম পূর্ণের আগমনে

সেই থাকের ভক্তসকলের আগমন পূর্ণ হইল। অতঃপর আর কেহ এখানে আসিবে না।"

হঠযোগী নারায়ণ কালীবাড়ীতে আসিয়া পঞ্চবটীতলে কুটীরে থাকিয়া নেতি ধৌতি প্রভৃতি ক্রিয়া দেখাইয়া বহু লোককে কৌতুহলাক্রান্ত করিয়াছিলেন। স্বামী যোগানন্দও এই সকল ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, হঠযোগ অভ্যাস না করিলে কামাদি রিপু যায় না এবং ভগবান্ লাভও হয় না। যোগানন্দজী একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, কি করে কাম দূর করা যায়?" তাঁহার ধারণা ছিল, ঠাকুর তাঁহাকে কোন যোগাসন বা প্রাণায়াম করিতে বা হরীতকী কি অন্য কিছু খাইতে উপদেশ দিবেন। কিন্তু ঠাকুর তাহাকে বলিলেন "খুব হরিনাম করবি, তাহলেই কাম যাবে।" উক্ত উপদেশ যোগানন্দজীর আদৌ মনঃপূত হইল না। তিনি ভাবিলেন, উনি যৌগিক প্রক্রিয়াদি জানেন না বলিয়া ঐরূপ উপদেশ দিলেন। একদিন যোগানন্দজী অগ্রে ঠাকুরের নিকট না যাইয়া হঠযোগীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কথা মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন। এমন সময় ঠাকুর তথায় যান এবং যোগানন্দজীর হাত ধরিয়া নিজ ঘরের দিকে যাইতে যাইতে বলিলেন, "তুই ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাস্‌নি। হঠযোগের ক্রিয়াদি শিখলে ও করলে শরীরের উপরেই মন পড়ে থাক্‌বে। ভগবানের দিকে মন যাবে না।" পরে ঠাকুরের কথামত স্বামী যোগানন্দ খুব হরিনাম করিতে লাগিলেন এবং অল্প দিনেই ফল পাইলেন এবং কামমুক্ত হইলেন।

নরেন্দ্রনাথ যখন ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর ছিল এবং তিনি এফ. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত

হইতেছিলেন। উহা ১২৮৭ সালের হেমন্তকালে বা ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ঘটিয়াছিল। প্রথম দিন তিনি পশ্চিম দ্বার দিয়া ঠাকুরের ঘরে ঢুকিলেন এবং গঙ্গাজলের জালার পাশে যে মাদুর পাতা ছিল তাহার উপর বসিলেন। ঠাকুরের অনুরোধে তিনি ব্রাহ্ম সঙ্গীত "মন চল নিজ নিকেতনে" ষোল আনা মন প্রাণ ঢালিয়া ধ্যানস্থ হইয়া গাহিলেন। নরেন্দ্রের গান শুনিয়া ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর বলিতেন, "সে চলিয়া যাইলে তাহাকে দেখিবার জন্য প্রাণের ভিতরটা চব্বিশ ঘণ্টা এমন ব্যাকুল হইয়া রহিল যে, বলিবার নহে। সময়ে সময়ে এমন যন্ত্রণা হইত যে, মনে হইত বুকের ভিতরটা যেন কে গামুছা নিঙড়াইবার মত জোর করিয়া নিঙড়াইতেছে। তখন আপনাকে আর সাম্‌লাইতে পারিতাম না। ছুটিয়া বাগানের উত্তরাংশে ঝাউতলায়, যেখানে কেহ বড় একটা যায় না, যাইয়া 'ওরে তুই আয়রে, তোকে না দেখে আর থাক্‌তে পাচ্ছি না,' বলিয়া ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতাম। খানিকটা এইরূপ কাঁদিয়া তবে আপনাকে সামলাইতে পারিতাম। ক্রমান্বয়ে ছয় মাস ঐরূপ হইয়াছিল, আর সব ছেলেরা, যারা এখানে আসিয়াছে তাহাদের কাহারো জন্য কখনো কখনো মন কেমন করিয়াছে। কিন্তু নরেন্দ্রের জন্য যেমন হইয়াছিল তাহার তুলনায় সে কিছুই নয় বলিলে চলে!"

আর একদিন নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে আসিয়াছেন। তখন তিনি ঈশ্বরদর্শনের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন?" — ঠাকুর সহাস্যে উত্তর দিলেন, "হাঁ, তাঁকে দেখেছি। তোকে যেমন দেখছি, তার চেয়ে

আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে তাঁকে দেখেছি। তোকে দেখাতেও পারি।” এই বলিয়া পরমহংসদেব নরেন্দ্রকে স্পর্শ করিলেন। ঠাকুরের দিব্য স্পর্শে নরেন্দ্র বাহ্য জ্ঞান হারাইলেন। তখন তিনি ভীত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “ওগো তুমি আমার একি করলে গো? আমার যে বাপ মা আছেন!” তখন ঠাকুর হাসিয়া উঠিলেন এবং নরেন্দ্রের বক্ষ হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিলেন, তবে এখন থাক, একেবারে কাজ নাই, কালে হবে।”

ঠাকুর নরেন্দ্রকে সতত ব্রহ্মচর্য্য পালনে উৎসাহিত করিতেন এবং বলিতেন, ‘বার বৎসর অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনের ফলে মানবের মেধা নাড়ী খুলিয়া যায়। তখন তাঁহার বুদ্ধি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয় সকলে প্রবেশ ও উহাদের ধারণা করিতে সমর্থ হয়। ঐরূপ বুদ্ধি সহায়েই ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। তিনি কেবলমাত্র ঐরূপ শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর!” আর একদিন ঠাকুর নরেন্দ্রকে পঞ্চবটীতলে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন, “ছাখ্ তপস্যার প্রভাবে আমাতে অণিমাদি বিভূতি সকল অনেক কাল হইল উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আমার ন্যায় ব্যক্তির, যাহার পরিধানের কাপড় পর্য্যন্ত ঠিক থাকে না, তাহার ঐ সকল যথাযথ ব্যবহার করিবার অবসর কোথায়? তাই ভাবিতেছি, মাকে বলিয়া তোকে ঐ সকল প্রদান করি। কারণ, মা জানাইয়া দিয়াছেন, তোকে তাঁর অনেক কাজ করিতে হইবে। ঐ সকল শক্তি তোর ভিতরে সঞ্চারিত হইলে কার্য্যকালে তুই ঐ সকল লাগাইতে পারবি। কি বলিস্?” উক্ত প্রস্তাবে নরেন্দ্র চিন্তিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মশায়, ঐ সকলের দ্বারা আমার ঈশ্বরলাভ বিষয়ে সহয়তা হইবে কি?” ঠাকুর উত্তর দিলেন, “সে বিষয়ে সহায়তা না হইলেও ঈশ্বর

লাভ করিয়া যখন তুই তাঁহার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইবি তখন উহার বিশেষ সহায়তা করিতে পারিবে।" ইহা শুনিয়া নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "মহাশয়, আমার ঐ সকলে প্রয়োজন নাই। আগে ঈশ্বরলাভ হউক পরে ঐ সব গ্রহণ করা না করা সম্বন্ধে স্থির করা যাইবে। বিচিত্র বিভূতি সকল লাভ করিয়া যদি উদ্দেশ্য ভুলিয়া যাই এবং স্বার্থপরতার প্রেরণায় উহাদিগকে অযথা ব্যবহার করিয়া বসি, তাহা হইলে সর্বনাশ হইবে যে!"

এক অর্থে সারদামণি দেবীই ঠাকুরের প্রথম শিষ্য বা শিষ্যা। তিনি বকুলতলায় নহবতে প্রায় তের বৎসর নীরবে থাকিয়া গুরুতুল্য দেবপতির সেবা করেন। একদিন সারদা দেবী ঠাকুরের পাদসম্বাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে তোমার কি মনে হয়?" ঠাকুর উত্তর দিলেন, "মন্দিরে যে মা আছেন, যিনি আমার শরীরের জন্ম দিয়াছেন তিনিই তুমি। তোমাকে সাক্ষাৎ জগদম্বার প্রতিমূর্ত্তি বলিয়াই দেখি।" নহবতে শ্রীশ্রীমার কাছে গৌরী পুরী, গোলাপ মা, যোগীন মা এবং গোপালের মা প্রভৃতি ঠাকুরের স্ত্রীভক্তগণ আসিয়া থাকিতেন। ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীমার সাক্ষাৎ খুব কমই হইত। তাই তিনি একদিন কোন স্ত্রীভক্তের দ্বারা ঠাকুরকে বলিয়া পাঠাইলেন, 'তাঁকে বোলো, আমার যেন একটু ভাব হয়।' অচিরে শ্রীমার প্রার্থনা ঠাকুর পূর্ণ করিলেন। এক মধ্য রাত্রে ঠাকুর ভাবাবেশে শ্রীমা প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত প্রায় এক সের হালুয়া ভক্ষণ করেন। আর একদিন ঠাকুর কালী-ঘর হইতে ভাবের ঘোরে মাতালের মত টলিতে টলিতে স্বীয় কক্ষে আসিয়া দেখিলেন, তথায় শ্রীমা উপস্থিত। তিনি শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি কি মদ খেয়েছি। শ্রীমা তাঁহাকে বলিলেন,

"না, তুমি মদ খাবে কেন? তুমি মা কালীর ভাবামৃত পান করেছ।" শ্রীমার কথা শুনিয়া ঠাকুর বালকবৎ আশ্বস্ত হইলেন।

স্বামী যোগানন্দ একদিন বাজারের কোন দোকানীকে ধর্মভয় দেখাইয়া একটী লোহার কড়া আনিয়া বাড়ীতে দেখিলেন, দোকানী তাঁহাকে ঠকাইয়া ফাটা কড়া দিয়াছে। ঠাকুর ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে তিরস্কারপূর্বক বলিলেন, "(ঈশ্বর) ভক্ত হইতে হইবে বলিয়া কি নির্বোধ হইতে হইবে? দোকানী কি দোকান ফাঁদিয়া ধর্ম করিতে বসিয়াছে যে, তুই তার কথায় বিশ্বাস করিয়া কড়াখানা একবার না দেখিয়াই লইয়া চলিয়া আসিলি? আর কখনো ঐরূপ করিবি না। কোন দ্রব্য কিনিতে হইলে পাঁচ দোকান ঘুরিয়া তাহার উচিত মূল্য জানিবি। দ্রব্যটী লইবার কালে বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবি। আবার যে সকল দ্রব্যের ফাউ পাওয়া যায় তাহার ফাউটী পর্য্যন্ত না গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবি না।" কেহ চাকুরী করিতেছেন শুনিলে ঠাকুর অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তৎশিষ্য স্বামী নিরঞ্জনানন্দ চাকুরী স্বীকার করিয়াছিলেন শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুই তোর বৃদ্ধা মাতার জন্য করিতেছিস তাই। নতুবা চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিস্ শুনিলে তোর মুখ দেখিতে পারিতাম না।"

কলিকাতার বাগবাজার পল্লীবাসী শ্রীবলরাম বসু ঠাকুরের পরম ভক্ত ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াই পূর্বপরিচিতের ন্যায় সাদরে গ্রহণপূর্বক বলিয়াছিলেন, "ইনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গের অন্যতম, এখানকার লোক। শ্রীঅদ্বৈত ও নিত্যানন্দ প্রভুপাদদিগের সহিত সংকীর্তনের বন্যা আনিয়া কিরূপে মহাপ্রভু দেশের আবালবৃদ্ধ নরনারীকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন ভাবাবেশে তাহা

দর্শন করিবার কালে ঐ অদ্ভুত দলের মধ্যে ইহাকে দেখিয়াছিলাম।" বলরাম বৈষ্ণব বংশে জাত এবং বৈষ্ণব পরিবেশে বর্ধিত। তিনি মশকাদি কীটপতঙ্গদিগকেও কখন কোন কারণে আঘাত করিতেন না। তাঁহার মনে একদিন সংশয় উঠিল, মশকাদি মারা উচিত কি না? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া ঠাকুরের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবার পূর্বে তিনি স্তম্ভিত হইয়া দেখিলেন, ঠাকুর স্বীয় বালিশ হইতে ছারপোকা বাছিয়া সেইগুলি মারিতেছেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "বালিশটাতে বড় ছারপোকা হইয়াছে। দিবারাত্রি দংশন করিয়া চিত্তবিক্ষেপ এবং নিদ্রার ব্যাঘাত করে। সেজন্য এগুলি মারিয়া ফেলিতেছি।" বলরাম আবশ্যকীয় নীতি শিক্ষালাভ করিলেন এবং তাঁহার সংশয় নিরাকৃত হইল। অবতার পুরুষও মানব-ভূমিতে অবস্থান কালে প্রাকৃত মানবৎ আচরণ করেন।

খ্রীষ্টভক্ত উইলিয়ামস্ ঠাকুরের নিকট কয়েকবার আসিবার পরেই তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া জানিতে পারেন এবং বলেন, "ঠাকুর নিত্যচিন্ময়বিগ্রহ ঈশ্বরপুত্র ঈশামসি।" ঠাকুরের উপদেশে তিনি সংসার ত্যাগপূর্ব্বক পাঞ্জাবের হিমালয় পর্বতের কোন স্থলে তপস্যাদিতে নিযুক্ত হইয়া শরীর পাত করেন। তরুণ ভক্ত হরিশ অধিকাংশ সময় কালীবাড়ীতে থাকিয়া ঠাকুরের সেবা ও ঈশ্বরচিন্তা করিতেন। পিতৃগৃহ বা শ্বশুরালয়ের কাহারো কথায় তিনি কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার প্রশান্ত একনিষ্ঠ প্রকৃতির দিকে অন্যান্য ভক্তের চিত্তাকর্ষণার্থ ঠাকুর বলিতেন, "মানুষ যারা জ্যান্তে মরা, যেমন হরিশ।" যদু মল্লিকের বাগানে মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর যখন আসেন তখন ঠাকুর

সেখানে ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তা বাবু আমি তোমায় রাজা বলিতে পারবো না। কেন না, সেটা মিথ্যা কথা হবে।" ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কর্তব্য কি? ঈশ্বরচিন্তা মানবের করাই কর্তব্য কি না?" যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর উত্তর দিলেন, "আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি আর মুক্তি আছে? যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন!" ইহাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি কি রকম লোক গা! যুধিষ্ঠিরের নরক-দর্শনই মনে করে রেখেছ! তাঁর সত্যনিষ্ঠা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বিবেক, বৈরাগ্য, ঈশ্বর-ভক্তি এ সব কিছু মনে হয় না?" তিনি আরো কত কিছু বলিতে যাইতেছিলেন। হৃদয় তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলেন। একটু পরেই যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

কোন্নগরের নবচৈতন্য মিত্র ঠাকুরের পূত সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুর যেদিন পাণিহাটীর মহোৎসব হইতে নৌকায় উঠিলেন তখন তিনি উৎসব-স্থল হইতে উন্মত্তবৎ ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া প্রাণের আবেগে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আমায় কৃপা করুন।" তাঁহার ভক্তি ও ব্যাকুলতা দর্শনে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিলেন। তাঁহার পূত স্পর্শে নবচৈতন্য পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া নৌকার উপরেই তাণ্ডব নৃত্য এবং ঠাকুরকে নানারূপ স্তবস্তুতিপূর্বক বারম্বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে নবচৈতন্যের পিঠে হাত বুলাইয়া ঠাকুর তাঁহাকে শান্ত করিলেন। চৈতন্য, বুদ্ধ, রাম, খ্রীষ্ট বা কৃষ্ণাদি জগৎগুরুর ন্যায় ঠাকুর স্পর্শমাত্রই অন্যের মনে ধর্মভাব সঞ্চার করিতে পারিতেন। তৎশিষ্য স্বামী শিবানন্দকে তিনি তিন বার স্পর্শমাত্রই সমাধিস্থ করিয়াছিলেন।

কেশবচন্দ্র যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে যাইতেন তখন কিছু ফলমিষ্টি লইয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিতেন এবং অনুগত শিষ্যের মত তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া সৎপ্রসঙ্গ করিতেন। একদিন ঠাকুর রহস্যচ্ছলে তাঁহাকে বলিলেন, "কেশব, তুমি এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর। আমাকে কিছু বল।" ভক্ত কেশব তাঁহাকে বিনীত ভাবে উত্তর দিলেন, "মহাশয়, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচিতে বসিব? আপনি বলুন, আমি শুনি। আপনার মুখের দুই চারিটী কথা লোককে বলিবা মাত্র তাহারা মুগ্ধ হয়।" আর একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে কেশবকে বুঝাইলেন যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ। কেশব উহার মর্মার্থ হৃদয়গত করিলেন। অনন্তর ঠাকুর কেশবকে বলিলেন, ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান্ একে তিন, তিনে এক। কেশব এই তত্ত্বের গূঢ়ার্থও অঙ্গীকার করিলেন। তৎপরে ঠাকুর যখন আবার বলিলেন, "গুরু, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব তিনে এক একে তিন। তোমাকে এখন একথা বুঝাইয়া দিতেছি।" কেশব তখন বিনীত ভাবে জানাইলেন, "পূর্বে যাহা বলিয়াছেন তাহার অধিক এখন আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না।" ঠাকুরও তাহাতে বলিলেন, "বেশ, বেশ এখন ঐ পর্য্যন্ত থাক্।"

ভাবাবেশে ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, তাঁহার প্রধান লীলাসহচর নরেন্দ্র সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি, নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ। তাঁহার শিষ্য স্বামী প্রেমানন্দ সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, শ্রীমতীর অংশে এর জন্ম। প্রেমানন্দজী একদা ঠাকুরকে ধরিয়া বসিলেন, আমার যেন ভাবসমাধি হয়। ঠাকুর জগন্মাতাকে স্বশিষ্যের কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। ইহাতে জগদম্বা বলিলেন, ওর ভাব হবে না, "ওর জ্ঞান হবে।" বর্দ্ধমানের মহারাজার

সভাপণ্ডিত পদ্মলোচনও ঠাকুরকে দেখিতে আসেন। ঠাকুরের মুখে মধুর মাতৃসঙ্গীত শ্রবণে তিনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিতে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান লোপ এবং অদ্ভুত উপলব্ধির কথা শুনিয়া পণ্ডিতজী নির্বাক্ হইয়াছিলেন। তিনি ন্যায়-বেদান্ত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অলৌকিক বিভূতিও ছিল। ঠাকুর তাঁহার বিভূতি হরণপূর্ব্বক তাঁহাকে মুমুক্ষুত্ব দান করেন। তখন পণ্ডিতজী ঠাকুরকে সাক্ষাৎ নিজ ইষ্টজ্ঞানে স্তবস্তুতি করেন। তদবধি তিনি ঠাকুরকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া জ্ঞান ও তদ্রূপ ভক্তি করিতেন। অসুস্থ অবস্থায় তিনি ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, "আমি সেরে উঠে সব পণ্ডিতদের ডাকিয়ে সভা করে সকলকে বলবো, আপনি ঈশ্বরাবতার আমার কথা কে কাট্‌তে পারে দেখবো!"

কামারহাটীর সিদ্ধা সাধিকা অঘোরমণি ওরফে গোপালের মা বহু বৎসর গোপাল-মন্ত্র জপাদি দ্বারা সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। তিনি স্বীয় ইষ্টদেব গোপাল-মূর্তির নিরন্তর দর্শন পাইতেন। ঠাকুরকে দর্শন করিবার পর তিনি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ইষ্টদেব জ্ঞানে সেবা ও ভক্তি করিতেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে মাতৃবৎ দেখিতেন।

ঠাকুর এক প্রাতঃকালে ঘোড়া গাড়ীতে চড়িয়া কলিকাতায় বলরাম বসুর বাটীতে যাইতেছিলেন। গাড়ী যখন সদর ফটক পর্য্যন্ত আসিল, তখন ঠাকুর সঙ্গী শিষ্য যোগীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে নাইবার কাপড় গামুছা এনেছিস্ ত?" যোগীন উত্তর দিলেন, "না মশাই, গামুছা এনেছি; কিন্তু কাপড়খানা আনতে ভুল হয়েছে। তা তারা আপনার জন্য একখানা নূতন কাপড় দেখে-শুনে দেবে এখন।" ইহা শুনিয়া ঠাকুর বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "ওকি তোর কথা! লোকে

বলবে, কোথা থেকে একটা হাবাতে এসেছে। তাদের কষ্ট হবে আতান্তরে পড়বে। যা, গাড়ী থামিয়ে নেবে গিয়ে কাপড় নিয়ে আয়।” অবিলম্বে শিষ্য গুরুর আদেশ পালন করিলেন। প্রতাপ হাজরা কালীবাড়ীতে মাঝে মাঝে থাকিয়া সাধুভাবে কাটাইতেন। তিনি একবার ঠাকুরের সহিত কলিকাতায় ভক্তদের নিকট যান এবং ফিরিবার সময় নিজের গামুছাখানি ভুলক্রমে ফেলিয়া আসেন। ইহা শুনিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, “ভগবানের নামে আমার পরণের কাপড়ের হুস্ থাকে না। কিন্তু আমি তো একদিনও নিজের বেটুয়া বা গামুছা কলিকাতায় ভুলিয়া আসি না। আর তোর একটু জপ করে এত ভুল!” ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে শিখাইয়াছিলেন, “গাড়ীতে বা নৌকায় আগে গিয়ে উঠবে। আর নামবার সময় কোন জিনিষটা নিতে ভুল হয়েছে কি না দেখে শুনে সকলের শেষে নাম্‌বে।” সিদ্ধাবস্থায়ও এত সামান্য বিষয়ে ঠাকুরের তীক্ষ দৃষ্টি ছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত দক্ষিণেশ্বরে কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রীকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি পেটের দায়ে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন। মধুসূদন ঠাকুরের মুখে কিছু ধর্মোপদেশ শুনিতে চাহিলেন। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাকে কিছু ধর্মকথা বলিতে পারেন নাই। ঠাকুর বলিতেন, “আমার মুখ যেন কে চেপে ধরলে, কিছু বলতে দিলে না।” রাজস্থানের পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী ঠাকুরের পূত স্পর্শে বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব লাভ করেন। তিনি ঠাকুরের নিকট সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক বশিষ্ঠাশ্রমে যাইয়া কঠোর তপস্যা দ্বারা দেহপাত করেন। এক সন্ধ্যায় স্বামী অদ্ভুতানন্দ ঠাকুরের ঘরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। ইহা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, “ওরে লাটু, এখন ঘুমাবিত ধ্যান

করবি কখন?" গুরুবাক্যে শিষ্য সেদিন হইতে চিরতরে রাত্রিতে নিদ্রাত্যাগ করিলেন, এবং সারা রাত্রি ধ্যানে কাটাইতে লাগিলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ এক সময় বেদান্ত-চর্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন। এইজন্য তিনি তখন ঠাকুরের কাছে বেশী আসিতে পারিতেন না। ইহা শুনিয়া একদিন ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "কি গো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্ত বিচার করছ? তা বেশ, বেশ। তা বিচার ত খালি এই গো—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। না আর কিছু?" দেবতুল্য গুরুবাক্যে শিষ্যের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইল।

তখন কালীবাড়ীতে রসিক* নামে একটী মেথর কাজ করিত। সে রাস্তা-ঘাট, গাছতলা ও উঠানাদি ঝাট দিত এবং অশৌচ স্থানগুলি পরিষ্কার করিত। সে নিত্য দেখিত, ঠাকুরের নিকট নানা স্থান হইতে ভক্তগণ আসিতেছেন এবং অহর্নিশ ভগবৎপ্রসঙ্গ, ভজন ও কীর্তন চলিতেছে। ভক্তিমান্ রসিক ভাবিল, "দূর দূর স্থান হইতে নর-নারীগণ ঠাকুরের নিকট আসিয়া ধন্য হইয়া যাইতেছেন! আর আমি তাঁর পায়ের কাছে থাকিয়াও তাঁর কৃপা পাইব না!" সে অস্পৃশ্য বলিয়া নিজেকে খুব দীনহীন ভাবিত এবং সেইজন্য ঠাকুরের পাদস্পর্শপূর্বক প্রণাম করিতে সাহসী হইত না। ঠাকুর যে দিক দিয়া শৌচে যাইতেন সেই দিক রসিক উত্তমরূপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিত। ঠাকুরের প্রতি রসিকের ভক্তি-বিশ্বাস শুক্ল পক্ষের চাঁদের মত দিন দিন বাড়িতে লাগিল। দীনের ঠাকুর অন্তর্য্যামী রামকৃষ্ণ ভক্ত রসিকের মনোভাব বুঝিতে পারিলেন।

---

* ডাক নাম রস্‌কে

যেমন গাভীর দুগ্ধ স্বীয় বৎসের প্রতি স্বতঃই ক্ষরিত হয় তেমনি অবতারেব কৃপা-কণা প্রপন্নের উপর ঝরিয়া পড়িল। একদিন ঠাকুর গঙ্গাতীরস্থ ঝাউতলা হইতে শৌচান্তে ফিরিতেছেন। তিনি পঞ্চবটীর কাছে আসিতেই রসিক সাহসে বুক বাঁধিয়া তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইল। ঠাকুরও অবিলম্বে ভাবাবিষ্ট হইয়া রসিকের বুকে শ্রীপদ স্থাপনপূর্বক আশীষামৃত বর্ষণ করিলেন। ঠাকুরের অযাচিত অপার করুণালাভে রসিক কৃতকৃত্য হইল। প্রেমাশ্রু-ধারায় তাহার গণ্ডযুগল ও বক্ষস্থল প্লাবিত হইল। ভগবান্ ভক্তকে যুগপৎ ভক্তি ও মুক্তি উভয়ই দান করিলেন। সেই দিন হইতে রসিক নবজন্ম লাভ করিল। দূর হইতে ঠাকুরের শ্রীমূর্তি দর্শন বা কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিলেই তাহার সুনত সংশুদ্ধ হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। কখনো বা সে ঠাকুরকে ভক্তিভরে প্রণাম করিত এবং কম্পিত কলেবরে তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইত। দেখা হইলে কখনো বা ঠাকুর তাহাকে দুই একটা কথা বলিয়া বা মৃদু হাস্য করিয়া সান্ত্বনা দিতেন। ইহা সম্ভবতঃ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্ধের বা মধ্যভাগের ঘটনা। ইহার কিছুদিন পরে ঠাকুর চিরতরে কালীবাড়ী ছাড়িলেন।

ঠাকুরের তিরোভাবের পরও রসিক কয়েক বৎসর বাঁচিয়াছিল শ্রীশ্রীপ্রভুর পুণ্য স্মৃতি বুকে ধরিয়াই সে পূর্ববৎ কালীবাড়ীতে স্বকর্ম করিত। ঠাকুরের স্মৃতি-পূত সকল স্থান ও বস্তু তাহার নিকট পরম পবিত্র বোধ হইত। প্রভু-ত্যক্ত ধরাধাম তাহার নিকট শূন্যপুরী মনে হইতে লাগিল। শ্রীশ্রীপ্রভুর সহিত চির মিলনের জন্য তাহার অন্তর আকুল হইল। সে পরপারের ডাক শুনিতে পাইল। একবার সে হঠাৎ সামান্য অসুখে শয্যাশায়ী হইল। অন্তিম শয্যায় তাহার মুখে ঠাকুরের

মহা নামই উচ্চারিত হইতে লাগিল। কালীবাড়ীর পার্শ্বেই ছিল তাহার পর্ণ কুটীর। জীবনের শেষ প্রান্তে সে তাহার স্ত্রীকে ডাকিয়া বলিল, "আরে! আমার খাটিয়াটা ঘরের বাহিরে নিয়ে রাখ। আজ আমি ঠাকুরের কাছে চলে যাব।" খাটিয়া সহ তাহাকে বাহিরে আনিয়া রাখিতেই সে মহানন্দে বলিয়া উঠিল, "গঙ্গাজল ছিটিয়ে দে আমার চারিদিকে। ঠ'কুর এসেছেন আমাকে নিতে।" ভগবানের দিব্য আবির্ভাবে ভক্তের আঙ্গিনা অপার্থিব আলোকে উদ্ভাসিত হইল। পর্ণকুটীর আজ দেবালয়ে পরিণত। ঠাকুরের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে রসিক সজ্ঞানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিল! মৃত্যুকালে তাহার মুখমণ্ডল স্বর্গীয় প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। ভক্ত ভগবানের চির সান্নিধ্য লাভ করিল।

১৮৮৫খ্রীঃ ঠাকুরের দিব্য ভাব বিশেষ ভাবে প্রকটিত হয়। তৎপূর্বেই তিনি তাঁহার চিহ্নিত ভক্ত-শিষ্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। সেই বৎসর প্রত্যহ নূতন নূতন লোক কালীবাড়ীতে তাঁহার দর্শনলাভে ও উপদেশ শ্রবণে ধন্য হন। কলিকাতার ধর্মপিপাসুগণ তাঁহার নাম শুনিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে দর্শন করেন। উক্ত সালের গ্রীষ্মকালে তিনি গরমে খুব কষ্ট পান এবং ভক্তগণের পরামর্শে বরফ খাইতে আরম্ভ করেন। দুই এক মাস বরফ খাইবার ফলে তাঁহার গলদেশে ব্যথা হয়, চৈত্রের শেষে অথবা বৈশাখের প্রারম্ভে। মাসাবধি কাল অতীত হইলেও উক্ত বেদনার উপশম হইল না। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে উহা বৃদ্ধি পাইল। ঔষধ-সেবনেও কোন উপকার হইল না। পানিহাটির মহোৎসবে যোগদানের ফলে ঠাণ্ডা লাগিয়া গলার ব্যথা আরো বাড়িয়া যায়। ভক্তগণের পরামর্শে ভাদ্রমাসের মধ্যে অথবা

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি চিরতরে কালীবাড়ী পরিত্যাগ পূর্বক চিকিৎসার্থ কলিকাতায় গমন করেন। কলিকাতায় প্রথমে বলরাম বসুর বাড়ীতে এক সপ্তাহ থাকিয়া তিনি শ্যামপুকুরে ভাড়া-বাড়ীতে প্রায় তিন মাস অবস্থান করেন। সম্ভবতঃ উক্ত বৎসর ১১ই ডিসেম্বর তিনি কাশীপুর বাগান-বাটীতে যান এবং তথায় ৮।৯ মাস থাকিয়া ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ (১৮৮৬ খ্রীঃ ১৬ই আগষ্ট) রবিবার পূর্ণিমা তিথিতে মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করেন। কাশীপুরে স্বহস্তে তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন, নরেন্দ্র লোক শিক্ষা দিবে। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছিল।

দেহরক্ষার কিছুদিন পূর্বে তিনি তাঁহার প্রধান পার্ষদ স্বামী বিবেকানন্দকে বলিয়াছিলেন, "যে রাম যে কৃষ্ণ ইদানীং একাধারে সেই রামকৃষ্ণ। তবে এ তোর বেদান্তের দিক্ দিয়ে নয়।" ঠাকুর তৎশিষ্য শ্রীমকে বলিয়াছিলেন, "তাঁহাকে (ঠাকুরকে) চিন্তা করিলেই হইবে, আর কিছু করিতে হইবে না। তিনি জগতের আদর্শ। তাঁহাকে চিন্তা করাই মুখ্য সাধন। আর সাধন যদি দরকার হয় তিনিই সমস্ত করাইয়া লইবেন।" স্বমূর্তি ধ্যান করিবার জন্য ঠাকুর কোন কোন অন্তরঙ্গ ভক্তকে উপদেশও দিয়াছিলেন। ঠাকূরের স্থূল দেহ কাশী পুরের শ্মশানঘাটে যথায় ভস্মীভূত হয় তথায় একটী ক্ষুদ্র স্মৃতি-মন্দির নির্মিত হইয়াছে। তাঁহার ভস্মাস্থির কিয়দংশ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসেই রামচন্দ্র দত্তের কাঁকুড়গাছিস্থ যোগোদ্যানে এবং অবশিষ্টাংশ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে বেলুড় মঠে প্রতিষ্ঠিত হয়। বেলুড় মঠ যেমন স্বামী বিবেকানন্দের লীলাক্ষেত্র, এবং বাগবাজারস্থ উদ্বোধন মঠ যেমন শ্রীসারদা দেবীর লীলাধাম, তেমনি দক্ষিণেশ্বর

কালীবাড়ীই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থল। ঠাকুরের সাধনা ও সিদ্ধির প্রভাবে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী বিশ্ব-তীর্থে পরিণত। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবন বা শ্রীরামচন্দ্রের লীলাভূমি অযোধ্যার ন্যায় শ্রীরাম-কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থ। এই মহাতীর্থের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিলেই দক্ষিণেশ্বরে তীর্থযাত্রা সফল হয়। হরি ওঁ তৎ সৎ। ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত*

এক

মিশ্র আড়ানা—একতালা

ওরে এই দক্ষিণেশ্বরে।
দেবতা মানব পূজারীর বেশে
আপনার পূজা করে॥
স্বরূপ ভুলিয়া পূজারী বেভুল
'মা, মা' বলি কাঁদিয়া আকুল
এই আঙ্গিনার ধূলায় লুটায়
নয়নে অমিয় ঝরে॥
সাথী-হারা তরু, লতা ফুলবন
বুকে অদেখার জ্বালা।
নীরবে নিশীথে গাঁথে আন্‌মনে
অশ্রু-নীহার-মালা॥
পঞ্চবটীর আঁখি-পল্লব
খুঁজে দিশাহারা কোথা বল্লভ
সব স্মৃতি আছে, সে কোথায় ওরে
মন যারে খুঁজে মরে॥

---

* ভক্ত-কবি শ্রীপ্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত।

দুই

ভাঙ্গা কীর্তন—দাদ্‌রা

কালী গো হয়েছিস্ কি মা তুই
রামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে।
(মা তোর) করে অসি নাই মুণ্ডমালা কি
ভাসালি জাহ্নবীর নীরে॥
[মা তোর অসি বুঝি আজ হয়েছে বাঁশী।
পঞ্চবটীর মূলেতে বসি, অসি বুঝি আজ হয়েছে বাঁশী।
'ওরে আয় আয়' বলে বাজে সে বাঁশী,
অসি বুঝি আজ হয়েছে বাঁশী।]
রাজেশ্বরী কি হয়ে দীনা হীনা
কণ্ঠে দোলায়ে প্রেমে-বাঁধা বীণা
নিজ স্তুতি গানে হলি মা মগনা
ভবতারিণীর মন্দিরে॥
নিজেরে লুকায়ে রেখেছিলি মাগো
জানি না কেন সে রূপধারা
ভকতের ধারাময়ী দিঠি-পাশে
স্বরূপ প্রকাশি দিল ধরা॥
শুনেছি কাঙ্গালে করিতে করুণা
রামকৃষ্ণ-বেশে এলি শবাসনা
এ দীনেরে মাগো ভুলো না, ভুলো না
রেখো শ্রীচরণে কৃপা করে॥

তিন

মিশ্র দেশ—কাহারবা

তব কথামৃত তপ্ত এ জীবনে।
শান্ত করিবে জ্বালা ভয় কিবা মরণে॥
কবিজন স্তুতি গায় অমিয় এ বাণী
শুনে হয় মঙ্গল জুড়ায় পরাণী
মুছে যায় কলুষ যা ভরা আছে মনে
কল্মষহারী নাম পশিলে শ্রবণে॥
বেদান্ত, বেদ নহে প্রেমেরি সাগর।
মন্থনে প্রভু আনে এ সুধারি আকর॥
'শ্রীম্' যে ভাণ্ডারে মহেন্দ্র ক্ষণে
রাখিল এ অমৃত পরম যতনে
শ্রীরামকৃষ্ণে স্মরি লিখি এক মনে।
প্রচারিলা 'নব বেদ' শুনে জগজনে॥

চার

ভৈরবী মিশ্র—দাদ্‌রা

আমার মন-পাপিয়া রে, রামকৃষ্ণ-গুণ গাও।
রামকৃষ্ণ-গুণ গাও রে, রামকৃষ্ণ-গুণ গাও॥
দেহের পিঞ্জরে তোরে শ্রীগুরু যতন করে
শিখালেন যে একটি বুলি তাই মোরে শুনাও॥

কোকিল কুহু তুঁহু তানে বলে কোথায় তুমি
চন্দনা তার বন্দনা-গান গায় যে দিবস-যামী
সেই সুরে আজ প্রেমের সুতায়
নামের মালা গাঁথবি রে আয়
(ওরে) নামের সাথে আছেন প্রভু
তার গলে পরাও ॥

পাঁচ

ভৈরবী—দাদ্‌রা

(আজি) প্রেমানন্দে মনরে গাহ রামকৃষ্ণ নাম ।
গাহ রামকৃষ্ণ নাম, জপ রামকৃষ্ণ নাম
নাম-সুধা পানে রহ মত্ত অবিরাম ।।
কামারপুকুর হল পুণ্য ব্রজধাম
সখাগণ লয়ে খেলে লীলা-অভিরাম
(আমার) মানস মুকুরে ভাসে সে ছবি সুঠাম ॥
নমো নমো চন্দ্রা দেবী নমো ক্ষুদিরাম
কৃপাময়ী মা জননী লহ গো প্রণাম ॥
জয়রামবাটীর মাটী চন্দন সমান
মা জননীর জন্মভূমি মহাতীর্থস্থান
মায়ের চরণে শরণ নিলে পুরে মনস্কাম ॥

ছয়

সুর মিশ্র—দাদ্‌রা

প্রেমভরে মনরে গাহ রামকৃষ্ণ নাম
শ্রীরামকৃষ্ণ নাম, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম।
আনন্দবর্ধক নাম, মম প্রাণারাম
রামকৃষ্ণ নাম, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম॥
অন্তরে যতনে রাখ মনরে অবিরাম
দীন কাঙ্গালেরি ধন রামকৃষ্ণ নাম
রামকৃষ্ণ নাম, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম॥
একই বৃন্তে ফুটিল রে রাধা কৃষ্ণ শ্যাম।
শিব কালী ব্রহ্মা বিষ্ণু শ্যামা সীতা রাম॥
নাম ব্রহ্ম একই জেনে মনরে গাহ নাম
জনম মরণ সাথী রামকৃষ্ণ নাম
রামকৃষ্ণ নাম, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম, শ্রীরামকৃষ্ণ নাম।

———

সাত

ভজন—কাহারবা

কৃষ্ণ কেশব গোপাল গদাধর
সবই মম প্রভু লীলা-অভিরাম।
কভু করে অসি শ্যামা, কভু ধরে মুরলী
কভু সীতা-প্রাণধন রঘুপতি রাম॥

সুন্দর ভালে পরি তিলক শশধর
কভু সাজে শঙ্কর শশাঙ্ক শেখর।
কভু বিনোদিনী রাধা মূরতি মনোহর
অতি অপরূপ অতি সুন্দর ঠাম॥
জননীর স্নেহে গড়া জনক সে কৃপাময়।
প্রেম-নির্ঝরিণী অন্তরে সদা বয়॥
যে যারে বেসেছ ভাল রাখ প্রাণে যতনে
আমি যে বেসেছি ভাল সে পূজারী ব্রাহ্মণে।
কাঙ্গালের সখা তিনি, দীন কাঙ্গাল আমি
তাই বড় ভালবাসি রামকৃষ্ণ নাম॥

আট

ভজন—কাহারবা

(নাচেরে) নাচে গো চন্দ্রা-দুলাল।
দক্ষিণেশ্বরে মা ভবতারিণীরে
ঘেরিয়া ঘেরিয়া নাচে দিয়ে করে তাল॥
সে নাচেতে জাহ্নবী হলো গো উতল
কল-কল্লোলে নাচি করে টলমল।
নাচে বন-বল্লরী, কবরীতে মঞ্জরী
কালাকাল ভুলে নাচে মহাকাল॥

আনন্দে চন্দনা সাথে নাচে ময়না।
তিরপিত হল আজ উপবাসী নয়না॥
প্রেমের নূপুরে বাঁধি আপন চরণ।
নাচে নিজে শ্যামা, নাচে মদনমোহন॥
মম মন-ময়ুরী নাচ এ লীলা স্মরি।
রামকৃষ্ণ নামে হওরে মাতাল॥

নয়

বাগেশ্রী—তেওরা

শ্রীরামকৃষ্ণ-দুলাল যে আমি, সারদেশ্বরী আমার মা।
শঙ্কর সম গুরুজী আমার নাহি কোন ভয় ভাবনা॥
যে নামেতে হয় শঙ্কা হরণ
যে নামেতে মরে আপনি মরণ
সেই নামেরি ডঙ্কার তালে
নাচিবে হৃদে শ্যামা॥
নামেরি শিকলে বাঁধি মহাকালে
আনিব ধরিয়া ধরণী পরে।
মা জননীরে ডাকিয়া বলিব
দেখ মা ও দুটী নয়ন ভরে॥

যমের প্রাসাদে দিব যে হুঙ্কার
'জয় রামকৃষ্ণ' বলি বারে বার।
বলিব 'রাজন্ খুব হুসিয়ার।
তোমার নাহিক ক্ষমা ॥'

দশ

সুর মিশ্র—কাহারবা

বন্ধুজন মিলি শুনাও শুনাও মোরে রামকৃষ্ণ শ্রবণে।
রামকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ নাম, লিখে দাও দেহভরি যতনে ॥
পূত জাহ্নবী-তীরে নিয়ে চল ধীরে ধীরে
মুখে রামকৃষ্ণ নাম বল জনে জনে।
কণ্ঠে পরাও মধু নামের মালিকা
প্রভুর মোহন ছবি ধর নয়নে ॥
যবে মহাশ্বাসে হবে রসহীন রসনা।
চরণামৃত মুখে দিতে যেন ভুলো না ॥
অন্তরে শিখা জ্বলে অন্তর্জলি জ্বলে
নিভিবে না ছেয়ে আছে সারা দেহ মনে।
শ্রীগুরু-চরণ-ধুলি অঙ্গে মাখিয়ে দাও
যাত্রা করাও শুভ লগনে ॥

স্বামী জগদীশ্বরানন্দের
কয়েকটি পুস্তক সম্বন্ধে সংবাদপত্রের অভিমত

১। **নবযুগের মহাপুরুষ**—২য় ভাগ (৫১০ পৃষ্ঠা, মূল্য ৫.০০ টাকা) কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক "জন-সেবক" পত্রিকায় ২৭শে আষাঢ়, ১৩৫৯ (১৩ই জুলাই, ১৯৫২) রবিবার এই পরিচয় প্রকাশিত হয়।—

"আলোচ্য গ্রন্থে স্বামী ত্রিগুণাতীত, অধরলাল সেন, অরবিন্দ ঘোষ, স্বামী কল্যাণানন্দ, স্বামী নিশ্চয়ানন্দ, স্বামী বোধানন্দ, শ্রীরমণ মহর্ষি, স্বামী শুভানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী রামতীর্থ, স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী নির্মলানন্দ, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, স্বামী বিরজানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা স্বামী জগদীশ্বরানন্দ নিপুণভাবে আলোচনা করিয়াছেন। যে পনেরো জন মহাপুরুষের জীবনী এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তন্মধ্যে স্বামী ত্রিগুণাতীত ও অধরলাল সেন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য এবং স্বামী বোধানন্দ, আত্মানন্দ, শুভানন্দ, কল্যাণানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ নির্মলানন্দ ও বিরজানন্দ এই সাতজন স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, শ্রীরমণ মহর্ষি, স্বামী রামতীর্থ, কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্রনাথ নবযুগের মহাপুরুষ। "এই সকল জীবনীতে শুধু ব্যক্তিগত কাহিনী বিবৃত হয় নাই, নবযুগের ভাবধারার ও ধর্মান্দোলনের যুগান্তকারী ইতিবৃত্ত আলোচিত। সুতরাং আধুনিক ধর্মভাবের সহিত পরিচিত হইতে হইলে এই পুস্তক অধ্যয়ন ও অনুধ্যান অত্যাবশ্যক। নবযুগের প্রতিনিধিস্থানীয় এতগুলি মহাপুরুষের জীবনী অন্য কোন পুস্তকে একত্রে পাওয়া যাইবে না।" যে শ্রম স্বীকার পূর্বক স্বামী জগদীশ্বরানন্দ পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠায় এই বিরাট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তজ্জন্য বাঙ্গালী পাঠক মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবে।"

২। **শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-প্রসঙ্গ**—(১৮৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ২.২৫ পয়সা)

কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক "যুগান্তর" ২০শে মাঘ, রবিবার, ১৩৫৮, (৩-২-৫২) তারিখে বলেন—

"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ভারতের আধ্যাত্মিক জীবনের এক সন্ধিক্ষণে যুগাবতাররূপেই বাংলাদেশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পাশ্চাত্য জড়বাদের মোহে যখন সমগ্র জাতি তাহার নিজস্ব সনাতন সত্তা বিস্মৃত হইবার উপক্রম করিয়াছিল সেই সময় দক্ষিণেশ্বরের এই নিরক্ষর সন্ন্যাসী তাঁহার সাধনার আলোকে দিশেহারা জাতিকে পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্র-শিষ্য এবং অন্তরঙ্গ ভক্তগণ এই আলোকের দীপ্তি দূর দূরান্তরে প্রসারিত করিয়া জাতীয় জীবনধারার গতি পরিবর্তন করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাণী এবং তাঁহার পার্ষদগণের জীবনী ও কথামৃত দেশবাসীর নিকট সেইজন্য পরম সম্পদ্। আলোচ্য পুস্তকে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কয়েকজন লীলাসহচরের উপদেশ ও পত্রাবলী সংকলন করিয়াছেন। এগুলি অদ্যাবধি অন্য কোনও পুস্তকে প্রকাশিত হয় নাই। কেবল ইহার কিয়দংশ উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার সরল ও অনাড়ম্বর ভাষা, আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতিব্যঞ্জক ব্যাখ্যা এবং স্বামী বিজ্ঞানানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ পরমহংসদেবের কয়েকজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের দৈনন্দিন জীবনের ছোট খাট ঘটনা সহজেই আকৃষ্ট করিবে।"

৩। **স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত** (১০৪ পৃষ্ঠা; মূল্য এক টাকা) সম্বন্ধে কলিকাতার "দেশ" সাপ্তাহিক ২৫শে আশ্বিন, ১৩৫৯ তারিখে লিখিয়াছিলেন—

গ্রন্থকার বাংলার পাঠক সমাজের নিকট সুপরিচিত। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্প্রদায় সন্ন্যাসী মণ্ডলের অন্যতম। তাঁহার লিখিত বহু গ্রন্থ চিন্তাশীল সমাজের সর্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। ১৯৪১ সালে করাচিতে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত সম্বন্ধে ইংরাজীতে যে ভাষণ প্রদান করেন প্রথমতঃ তাহা 'প্রবুদ্ধ ভারতে' প্রকাশিত হয়। পরে কিছু বৃহত্তর আকারে উহা কলিকাতা রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আলোচ্য

পুস্তকখানি তাহারই বাঙলা সংস্করণ। এতৎ সহ 'আদর্শ মানব কে? ঋষি কমরেড না অতিমানব' এই দ্বিতীয় পরিশিষ্ট এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ ও কিশোর বাংলা' শীর্ষক প্রবন্ধটি সংযোজিত হইয়াছে। এই দুইটি রচনা যথাক্রমে 'দৈনিক বসুমতীতে এবং 'কিশোর বাংলা' শীর্ষক মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শকে মনীষী গ্রন্থকার তাঁহার অন্তরের সমগ্র অগ্নিময় আবেগ দিয়া সাধারণের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন। পুস্তকখানি প্রচারে বাংলার সমাজ জীবনে প্রাণ শক্তির সঞ্চার হইবে এবং অবীর্য্য হইতে মুক্তি পাইয়া জাতি মনুষ্যত্বের পথে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রেরণা উপলব্ধি করিবে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

উক্ত পুস্তক সম্বন্ধে 'কিশোর বাংলা' (ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫৯) লিখিয়াছেন— "বহু সংখ্যক নামকরা বই লিখে স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম লাভ করেছেন। বর্তবান বইখানি পড়ে আমরা খুসী হয়েছি। স্বামী বিবেকানন্দের ভাববাশি ও প্রেরণা এককালে নতুন ভারতের, বিশেষ করে নতুন বাংলার জন্ম দিয়েছিল। গত মহাযুদ্ধের পর দেশে সর্বস্তবের নৈতিক অধঃপতন নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সময় বিবেকানন্দের ভাব বঙ্গ সমাজে অমৃতের কাজ করবে। দেশের প্রত্যেকটী কিশোর ও যুবককে এই অমূল্য গ্রন্থখানি পাঠ করতে আমরা অনুরোধ করি।"

কলিকাতার প্রসিদ্ধ দৈনিক **জনসেবক** পত্রিকায় ১১ই শ্রাবণ ১৩৫৯ (২৭শে জুলাই, ১৯৫২) রবিবার **স্বামী বিবেকানন্দ ও বর্তমান ভারত এবং "কিশোর গীতা"**—এই পুস্তকদ্বয় সম্বন্ধে নিম্নোক্ত পরিচয় প্রকাশিত হয়।

"স্বামী জগদীশ্বরানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু কেন্দ্রে প্রায় সাতাইস বৎসর কাজ করিবার পর এখন স্বতন্ত্র ভাবে নূতন কর্মক্ষেত্রে নামিয়াছেন। গ্রন্থ-রচনা ও ধর্মপ্রচারই তাঁহার জীবনের মহাব্রত। স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে লিখিত শতাধিক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত আলোচ্য গ্রন্থখানি যুগোপযোগী হইয়াছে। এই পুস্তকে গত শতাব্দীর ভারতের অবস্থা ও ভারতীয় সংস্কৃতির মর্ম বিশ্লেষণ

করিয়া গ্রন্থাকার স্বামীজীর জীবন-কথা আলোচনা করিয়াছেন। ইহা স্বামিজীর শুধু জীবনী নহে, বাণীমূলক গভীর আলোচনা। পরিশিষ্টে ভারতীয় সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গী এবং আদর্শ মানব সম্বন্ধে সুচিন্তিত প্রবন্ধ সংযোজিত হইয়াছে। স্বামীজীর উক্তি-চয়ন গ্রন্থখানির মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে।"

"স্বামী জগদীশ্বরানন্দ গীতার যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা বিশেষ জনপ্রিয়। 'কিশোর গীতা' কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী করিয়া লেখা। এই পুস্তকে গীতার সারমর্ম অধ্যায় অনুসারে গল্পের মত করিয়া বলা হইয়াছে। গীতার প্রসিদ্ধ শ্লোকগুলি অনুবাদ সহ যথাস্থানে প্রদত্ত। পুস্তকের প্রারম্ভে লেখক মহাভারতের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী গ্রন্থাবলী হইতে গীতা ও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে স্বামিজীর উক্তিগুলি সংগ্রহ করিয়া তিনি যে বাংলা প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন তাহা এই পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে পরিণত। এই অধ্যায় সর্বাগ্রে পাঠ করিলে গীতার মর্ম উপলব্ধি করা সহজ হইবে। গীতার উপক্রমণিকারূপে আলোচ্য গ্রন্থখানি অতুলনীয়।